KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title : সমকালীন (SAMAKALIN)	Size : 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number : ৩/- ৩/- ৩/- ৩/-	Year of Publication : পৌষ, ১৩৫২ শ্রাবণ, ১৩৫২ চৈত্র, ১৩৫২ ফাল্গুন, ১৩৫২
	Condition : Brittle / Good
Editor : সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নারায়ণ চৌধুরী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

রেজিষ্টার্ড নং সি ৩৫৯৭ মূল্য আট আনা সমকালীন

আদর্শ পথ্য
পানীয় ও খাদ্য

লিলি ব্র্যাণ্ড বার্লি

সম্পূর্ণ নিরাপদ ও স্বাস্থ্যপ্রদ

স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত

লিলি বার্লি মিলস্ লিঃ কলিকাতা-৪

সমকালীন

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সম্পাদক
সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নারায়ণ চৌধুরী

তৃতীয় বর্ষ শ্রাবণ ১৩৬২

নূতন বীমার কাজে
বিপুল সাফল্য
১৯৫৪ সালে

৩০ কোটি টাকার উপর

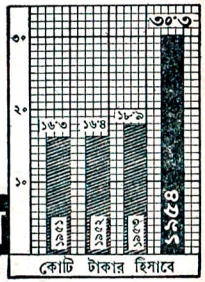

জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপেই হিন্দুস্থানের প্রতিষ্ঠা এবং গত ৪৮ বৎসর ধরিয়া জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপেই ইহা গড়িয়া উঠিয়াছে। আজ উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া ইহা নূতন গৌরব অর্জন করিয়াছে এবং দেশ ও দশের সেবায় কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার এক মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। এই সাফল্যের মূলে রহিয়াছে ত্রিবিধ নিরাপত্তার ভিত্তি :

★ সুষ্ঠু ও সুচিন্তিত পরিচালনা
★ জনসাধারণের অবিচলিত আস্থা
★ স্বল্প ব্যাপারের নিরাপত্তা

বোনাস আজীবন বীমায় ১৭৭৮
মেয়াদী বীমায় ৭৫৫
(প্রতি বৎসর প্রতি হাজার টাকার বীমায়)

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হেড অফিস : হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্, কলিকাতা-১৩

সমকালীন

॥ সূচীপত্র ॥

তৃতীয় বর্ষ শ্রাবণ ১৩৬২

প্রবন্ধ

ডায়লেক্‌টিক্‌স্ : অতুলচন্দ্র গুপ্ত ৯
বলেন্দ্রনাথের গদ্যরচনা : রথীন্দ্রনাথ রায় ২৪

কবিতা

অপেক্ষার দীপ : মোহিত চট্টোপাধ্যায় ১৭
কপোতের প্রার্থনা : অনিরুদ্ধ কর ১৮
অনির্ব্বচনীয় : হেনা হালদার ১৯
কী বলবে : দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ২০
মরণের পরে : সি জি রসেটি ২১
ঘড়ি : চার্লস্ বোদলেয়র ২২

গল্প

হিরোইন : প্রকাশ পাল ৩৫
উড়ো মেঘ : অনিলকুমার দলুই ৪১

উপন্যাস

পুরশ্চরণ : মদন বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৩

পরিচালক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

*

কালিদাসের নায়িকা

"হায়রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল," কিন্তু তাঁর নায়িকারা সৌন্দর্যে আজো অম্লান। রূপসৃষ্টিতে কবি সকলের আগে তাদের কেশ ও কেশকলাপের কথাই বলেছেন নানা ভঙ্গিতে। সুচারু কেশ-বিন্যাসের ভেতর দিয়েই তাদের রূপ ফুটে উঠেছে অপরূপ হয়ে। যা কালিদাসের নায়িকাদের পক্ষে সুলভ ছিল, লক্ষ্মীবিলাসের কল্যাণে আধুনিকাদের পক্ষেও তা আজ একেবারেই দুর্লভ নয়।

শতবর্ষের সুপরিচিত

লক্ষ্মীবিলাস তৈল

এম. এল. বসু য়্যাণ্ড কোং লিঃ

লক্ষ্মীবিলাস হাউস : : কলিকাতা—৯

সমকালীন

তৃতীয় বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩৬২

ডায়লেক্‌টিক্‌স্

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

গৌতমের ধর্মসূত্র থেকে তুলনায় অনেক অর্বাচীন যাজ্ঞবল্ক্যের ধর্মশাস্ত্র পর্যন্ত নানা পুঁথিতে 'বাকোবাক্য' নামে বিদ্যার উল্লেখ আছে। টিকাকারেরা ব্যাখ্যায় বলেছেন প্রশ্নোত্তর রূপ বিদ্যা। সহজেই অনুমান হয় বিদ্যাটি গ্রীকেরা যাকে বলেছে 'দিয়ালেগ'। প্লেটোর দার্শনিক রচনার কাঠামো 'সক্রেটিক ডায়লগ' যার অতি প্রসিদ্ধ উদাহরণ। আমাদের দেশে 'মিলিন্দ-প্রশ্ন' যার সুপরিচিত নমুনা। এই প্রশ্নোত্তর বা দিয়ালেগের মূল থেকেই আমাদের দেশে ও গ্রীকে তর্কশাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল। বিতর্কে পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ ভেদের স্পষ্ট নামকরণে তর্কশাস্ত্রের এই আদি ইতিহাস আমাদের দেশে বেঁচে আছে।

গ্রীক 'দিয়ালেগ' শব্দ থেকে ডায়লেক্‌টিক্‌ কথাটি তৈরী হয়েছে। দার্শনিক হেগেল বিশ্বের সৃষ্টি-রহস্যের এক চাবী আবিষ্কার করেছিলেন। বিশ্বের এবং বিশ্বের সব কিছুর বিকাশ ও প্রকাশ হয় ত্রিকের ছকে ছকে। যে কোনও বস্তু, ব্যাপার ও প্রতিজ্ঞার মধ্যেই রয়েছে একটা স্ববিরোধ। এই স্ববিরোধের চালনায় বস্তু, ব্যাপার বা প্রতিজ্ঞা তার বিপরীতে পরিণত হয়। কিন্তু 'রীত' ও বিপরীতের মহাবস্থানের অসংগতির তাড়নায় দু-এর মধ্যে আসে একটা সমন্বয়। এক ত্রিক সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু সমন্বয়ের মধ্যেও আবার সেই স্ববিরোধ। ফলে সমন্বয় পরিণত হয় তার বিপরীতে। এবং আবার আসে এক নূতন সমন্বয়। এইরকমে প্রতিজ্ঞা, বিরোধ ও সমন্বয়ের ত্রিকের পর ত্রিক চলতে থাকে, যতক্ষণ না পরাব্রহ্ম বা absoluteএর পূর্ণ বিকাশ হয়। যে absolute থেকে গতি আরম্ভ হয়েছিল, তাতেই সব পরিণত হয়। জন্মাদ্যস্য যতঃ।

হেগেল যখন তাঁর বিশ্বসৃষ্টির এই ডায়লেক্‌টিক্‌ তত্ত্ব প্রথম প্রচার করেছিলেন তখন ইউরোপের অনেক দার্শনিক মহলে জয়ধ্বনি উঠেছিল। যাক্‌, সব বোঝা গেল; রহস্য কিছু থাকলো না। দার্শনিক জ্ঞান চরমে পৌঁচেছে। দার্শনিক তত্ত্বের ধ্রুব কাঠামো চিরকালের জন্য খাড়া হয়েছে। এর পর আর সব দার্শনিক চিন্তা ঐ কাঠামোর মধ্যেই খুট খাট। পরে অবশ্য এক চাবীতে সব

তালা খোলার' দর্শনের যা ঘটে হেগেলের দর্শনেরও তা-ই ঘটলো। অভিনবত্বের আকস্মিক চমক কাটলে সমালোচনার প্রশ্ন জাগলো এ তত্ত্বের কতটুকু তথ্য কতটা কল্পনা। দু-একটা তালা খুলতেই সাফল্যের অত্মোন্মাদনায় চাবীকে 'মাষ্টার কী' মনে করা অবিদ্যার বিভ্রম কিনা? তর্কের শেষ থাকলো না। আক্রমণে সমর্থনে পুঁথি রচনা হ'লো বিস্তর। ছোট খাটো নানা দার্শনিক মতবাদের সৃষ্টি হ'লো। যেমন সৃষ্টি হয়েছে অন্য সব বড় দার্শনিকদের দার্শনিক তত্ত্ব থেকে। প্লেটোর 'আইডিয়া', কাণ্টের জ্ঞানের বিশ্লেষণ, সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ ভেদ, শংকরের অদ্বৈতবাদ থেকে। হেগেলের দর্শনও এইসব দর্শনের মত দর্শনশাস্ত্রীদের বিচারের বিষয় থেকে যেতো। কিন্তু হেগেলের ডায়লেক্‌টিক্‌স্ তত্ত্ব হঠাৎ দর্শনের ক্লাশ থেকে পলিটিক্সের ক্লাশে প্রমোশন পেলো। যা ছিল চিন্তার বস্তু, তা হ'লো কর্মের তূর্যধ্বনি। বিচিত্র ইতিহাস।

দুই

কার্ল মার্কস্ আবিষ্কার করলেন মানুষের সমাজের ক্রমপরিণতির তত্ত্ব। আদিতে মানুষের সমাজে শ্রেণী ভেদ ছিল না। একের পরিশ্রমে উৎপন্ন জীবনধারণ ও জীবনযাত্রার উপকরণ অপরে ভোগ করতো না। উৎপন্নের পরিমাণ ছিল এমন স্বল্প যে উৎপাদককে বাঁচিয়ে রাখতেই সমস্তটা নিঃশেষ হ'তো, ভোগের জন্য অবশিষ্ট কিছু থাকতো না। যখন উৎপাদনের পরিমাণ বাড়লো, বিশেষ কৃষির আবিষ্কারে, তখন একের পরিশ্রমের ফলের একটা অংশ অপরের ভোগে লাগান সম্ভব হ'লো, এবং মানুষের সমাজে শ্রেণী ভেদের সৃষ্টি হ'লো। সাধারণের চেয়ে যারা বুদ্ধিমান কি বলবান তারা উৎপাদনের উপায়গুলি, বিশেষ ভূমি, নিজেরা দখল করলো। তখন পরের দখলি এই উপায়গুলি দিয়ে যা উৎপন্ন হয়, প্রাণরাখার তা-ই উপায়। সুতরাং সমাজের সাধারণ লোকেরা বাধ্য হ'লো উপায়গুলির মালিকদের কাছে থেকে নানা সর্তে উপায়গুলিকে নিয়ে নিজেদের পরিশ্রমে ধন উৎপন্ন করতে, অর্থাৎ জীবনধারণ ও জীবনযাত্রার উপকরণ তৈরী করতে। এই উৎপন্ন ধনের যে অংশ ব্যয় হয় উৎপাদকদের বাঁচিয়ে ও মোটের উপর কর্মঠ রাখতে তা বাদে অবশিষ্ট ধন উৎপাদনের উপায়-গুলির মালিকেরা আত্মসাৎ করতে থাকলো। মানুষের সমাজে দুই শ্রেণীর সৃষ্টি হ'লো। এক শ্রেণী পরের হস্তগত উৎপাদনের উপায়গুলি দিয়ে পরিশ্রমে পেটভাতায় ধন উৎপন্ন করে,— সংখ্যায় এরা বেশী; অন্য শ্রেণী উৎপাদনের উপায়গুলির মালিকত্বের জোরে অপরের পরিশ্রমের সৃষ্টি ধনের বড় অংশ ভোগ করে,—সংখ্যায় এরা অল্প। মেহনতি শ্রেণী, ও মেহনতের ফলভোগী কৌশলী শ্রেণী। এই শ্রেণীভেদের ফলে, উৎপাদনের উপায় ও উৎপন্ন ধনের বাটোয়ারার বিশেষত্বের ভিত্তিতে এক বিশেষ আকারের সমাজ গড়ে ওঠে। কিন্তু এ রকম সমাজের সকল রকম গড়ন-ই অচিরস্থায়ী। কারণ যে উৎপাদনের উপায় ও উৎপন্নের বণ্টনের ব্যবস্থা এর ভিত্তি সে ভিত্তি স্থির নয়। তার মধ্যে থাকে একটা স্ববিরোধ। এর চালনায় উৎপাদনের চলতি উপায়গুলি বাতিল ক'রে সমাজের একদল লোকের হাতে আবিষ্কার হয় বেশী উৎপাদনের নূতন উপায়। উৎপাদনের উপায়গুলির মালিকত্ব চলে যায় সেই দলের হাতে। পূর্বের পরভুজ শ্রেণীর যায়গায় নূতন পরভুজ শ্রেণীর উদ্ভব হয়।

উৎপাদনের নূতন উপায়গুলির মালিকত্বের জোরে সেই শ্রেণীর লোকেরা অন্য সবাইকে পরিশ্রম করিয়ে তাদের পরিশ্রমের ফল ভোগ করে ও সমাজের কর্তৃত্ব করে। সমাজ এক নূতন গড়ন পায়। বণ্টনের ব্যবস্থায় কিছু অদল বদল হয়। কিন্তু সংখ্যায় বেশী মেহনতি শ্রেণী ও সংখ্যায় অল্প মেহনতের ফলভোগী কৌশলী শ্রেণী—এ শ্রেণী ভেদ বহাল থাকে। এই নূতন সমাজের ভিত্তিতেও সেই স্ববিরোধ। তার ফলে সমাজের এ নূতন গড়নও ফিরে যায়। প্রাচীন কৌশলী শ্রেণীকে ধ্বংশ ক'রে নূতন পরভুজ শ্রেণীর আবির্ভাব হয়। যারা নূতনতর উৎপাদনের উপায়গুলিকে আয়ত্বে এনে অন্য সকলের পরিশ্রমের ফলভোগ করে ও সমাজে কর্তৃত্ব করে। সমাজ আবার নূতন গড়ন পায়।

এমনি ক'রে শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর সংঘর্ষের তাড়নায় সমাজ-গড়নের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। সংঘর্ষে যে শ্রেণীর জয় হয় তাদের অস্ত্র পূর্বের চেয়ে অধিকতর উৎপাদনের উপায়ের প্রয়োগ, এবং সেই উপায়গুলির মালিকত্ব লাভ। সুতরাং শ্রেণীসংঘর্ষের ফলে উৎপন্নের পরিমাণ ক্রমে বাড়তে থাকে। যাতে মেহনতি শ্রেণীকে পেটভাতার উপরে অল্পস্বল্প উপরি দিয়েও অনেক অবশিষ্ট থাকে। এবং শ্রেণীসংঘর্ষে জয়ী শ্রেণীর পর জয়ী শ্রেণী অধিকতর ধনী হয়। এ সমাজ-ব্যবস্থায় প্রচুরতম উৎপাদনের এক বড় কৌশল অতি অল্প লোকের হাতে উৎপাদনের উপায়গুলি কেন্দ্রীভূত হওয়া। যাতে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ না হয়। সকলে সমানমনা ও সমানগতি হয়ে উৎপাদনের উপায়গুলিকে যদৃচ্ছা উন্নত থেকে উন্নতর করতে পারে। বহু ফলপ্রসূ উপায়ের স্থানে বহুতর ফলপ্রসূ উপায়ের প্রতিষ্ঠা হয়। এ পরিবর্তন চলতে চলতে এমন জায়গায় পৌছে যখন একদিকে আছে উৎপাদনের উপায়গুলির মালিক অতি ছোট এক শ্রেণী, যারা সে উপায়গুলিকে প্রচণ্ড শক্তিশালী ক'রে অমিত ধন উৎপাদনের উপযোগী করেছে; অন্য দিকে আছে সমাজের বাকী অগুন্তি মেহনতি জনতা যারা সেই উপায়গুলি দিয়ে অফুরন্ত ধন উৎপন্ন করছে। তখন শ্রেণীর সংঘর্ষ চরমে পৌছে। অতি ছোট মালিক শ্রেণীর সঙ্গে অতি প্রকাণ্ড মেহনতি শ্রেণীর সংঘর্ষ। উপযুক্ত নেতৃত্বের চালনায় মেহনতি জনতা ছোট মালিক শ্রেণীকে ধ্বংশ ক'রে উৎপাদনের শক্তিশালী উপায়গুলিকে দখল ক'রে নেয়। কৌশলী মালিক শ্রেণী নিজেদের কৌশলেই উৎখাত হয়। মানুষের সমাজে শ্রেণীভেদ লোপ হয়ে সাম্য ফিরে আসে। আরম্ভের দৈন্যের সাম্য নয়, পরিণতির প্রাচুর্যের সাম্য। অদ্বয় নির্গুণ সমাজব্রহ্ম, পরম ঐশ্বর্য্যশালী পূর্ণব্রহ্মে পরিণতি লাভ করে।

এ তত্ত্বের কতক মার্কসের সমাজের ঐতিহাসিক পরিণতির বিশ্লেষণ। বাকীটা তাঁর ভবিষ্যৎ-বাণী।

তিন

হেগেলের বিশ্বসৃষ্টির রহস্য-উদ্ঘাটনী ডায়লেক্‌টিক্‌স্ তত্ত্বের সঙ্গে মার্কসের মনুষ্য সমাজের ক্রম-পরিণতি ও চরম পরিণতি তত্ত্বের মিল আছে। সমাজের সকল অবস্থার মধ্যে স্ববিরোধ, তার ফলে শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর সংঘর্ষ, সংঘর্ষের তাড়নে ক্রমে উন্নততর উৎপাদন-ধর্মী সমাজ-ব্যবস্থার দিকে গতি,

এবং সে গতির শেষ পর্যায়ে চরম সংঘর্ষে শ্রেণীসংঘর্ষের লোপ, এবং অসীম ঐশ্বর্যশালী সমাজে সাম্যের প্রতিষ্ঠায় মনুষ্য সমাজের চরম পরিণতি। চোখ চাইলেই এ সব মিল চোখে পড়ে। কিন্তু মার্কস্ হেগেলের সঙ্গে এ সব মিলকে বিশেষ আমল দেন নাই। তিনি বলেছেন দার্শনিকেরা চায় সৃষ্টিকে বুঝতে, কিন্তু কাজের মত কাজ হচ্ছে সৃষ্টির পরিবর্তন ঘটানতে। অবশ্য মানুষের কোনও চেষ্টাতেই সব সৃষ্টির পরিবর্তন ঘটান যায় না। এই পৃথিবীতেই যায় না। পৃথিবীর বাইরে সৌর জগৎ। তার বাইরে নক্ষত্র জগৎ। তার বাইরে নীহারিকার জগৎ। তারও বাইরে অদৃষ্ট ও অজ্ঞাত খণ্ড খণ্ড বিশ্ব। মানুষ তবুও এদের কথা জানতে চায়। কেবল দার্শনিক নয়, বিজ্ঞানীরাও চায়। জ্ঞানের এই ঔৎসুক্যকে মার্কস্ ছেলেমানুষি ভাবতেন কিনা বলা কঠিন। কিন্তু এ কথা পরিষ্কার যে এ রকম জ্ঞানের তত্ত্বের সঙ্গে তিনি মানুষের সমাজের ক্রমপরিণতির তত্ত্বকে এক পর্যায়ের তত্ত্ব মনে করতেন না। যে তত্ত্ব সমাজের পরিবর্তন ঘটাবার কৌশল বলে না সে তত্ত্ব দিয়ে তিনি কি করবেন। মার্কস্ ছিলেন কর্মবাদী ঋষি। হেগেলের সৃষ্টি-রহস্যের ডায়লেক্‌টিক্‌সের সঙ্গে তাঁর আবিষ্কৃত সমাজের ক্রমপরিণতির ডায়লেক্‌টিক্‌সের মিল গরমিলের কথা তাঁর কাছে অবান্তর। ভগবান বুদ্ধ মানুষকে দুঃখনিবৃত্তির উপায়ের উপদেশ দিয়েছিলেন। মৃত্যুর পর আত্মা কি অবস্থায় থাকে সে অবান্তর প্রশ্নকে আমল দেন নাই।

চার

কিন্তু গুরুর উপদেশে ও অনুসরণে চললে শিষ্যদের চলে না। তথাগত শিষ্যদের উপদেশ করেছিলেন নিজের মনের আলোতে পথ চিনতে, ধার করা আলোতে নয়; নিজের তপস্যায় নির্বাণ পেতে পরের শরণ নিয়ে নয়। শিষ্যেরা ভরসা পেলে না। কল্পনায় করুণাময় বোধিসত্ত্বদের সৃষ্টি ক'রে তাদের শরণাপন্ন হ'লো।

মার্কসের সহগামী ও অনুগামীরা হেগেলের দর্শনের বিশ্বসৃষ্টি তত্ত্বের ডায়লেক্‌টিক্‌সের সঙ্গে মার্কসের আবিষ্কৃত সমাজের ক্রমপরিবর্তন ও পরিণতির ডায়লেক্‌টিক্‌সের মিল মার্কসের মত অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। বিশ্ব-সৃষ্টির মূলে যে ডায়লেক্‌টিক্‌স সমাজের ক্রমপরিণতির মূলেও সেই ডায়লেক্‌টিক্‌স এ কল্পনায় তাঁরা মনে ভরসা পেলেন। তবে সমাজের চরম পরিণতির মার্কসের যে ভবিষ্যৎবাণী তা সফল—'নিশিদিন ভরসা রাখিস ওরে মন হবেই হবে'। কারণ সৃষ্টি-রহস্যের কৌশলেই তা সফল হতে বাধ্য।

তবুও হেগেলের ডাইলেক্‌টিক্‌স থেকে মার্কসের ডায়লেক্‌টিক্‌সের প্রভেদ কল্পনা না করলে চলে না।

"হেগেলের ডাইলেক্‌টিক্‌সের সঙ্গে মার্কসের ডাইলেক্‌টিক্‌সের বাহ্যিক মিল থাকলেও বাস্তবে তা পরস্পর-বিরোধী। হেগেলের মতে চিন্তার যে পদ্ধতি সেই পদ্ধতিই হল বাস্তবের স্রষ্টা। হেগেল এই চিন্তা-পদ্ধতির নাম দিয়েছেন, "পরমভাব"। হেগেলের মতে বাস্তব জগৎ সেই "পরমভাবেরই" বহিঃপ্রকাশ। মার্কসের মতে বাস্তব জগৎই মানব মনে প্রতিফলিত হয়ে চিন্তায় রূপান্তরিত হয়।

এই চিন্তাই ভাব, তা অন্য কিছু নয়। মার্ক্সের ভাষায় "ভাব বাস্তবের স্রষ্টা নয়, বাস্তবই ভাবের স্রষ্টা"।" *

কথার ঘোরপ্যাঁচে মনকে প্রবোধ দেওয়া। কল্পিত বস্তুবাদকে হেগেলের 'ভাববাদের' গ্রাস থেকে রক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা। হেগেলের চিন্তায় মানুষের মনের মননের যে ধারা, বিশ্বসৃষ্টি বিকাশের তা-ই পদ্ধতি। সুতরাং rational is real। মার্কসীয় দার্শনিকেরা জ্ঞানের ব্যাপারে মনের বেশী জারিজুরি স্বীকার করতে পারেন না। তাতে তাঁদের 'বস্তুবাদ' না কি ঘা খায়। সুতরাং মনকে তাঁরা কল্পনা করেন দর্পনের মত। বাইরে যা ঘটে মনে তা ঠিক তেমনি প্রতিফলিত হয়। এই প্রতিফলনই মনের চিন্তা বা মনন। সুতরাং real is rational।

এ দু-এর প্রভেদ এক ব্যাপারকে সামনে থেকে ও পেছন থেকে দেখায় প্রভেদ। বাস্তবের ভেদ নয়। হেগেলের দর্শনে বিশ্বসৃষ্টির ডায়লেক্‌টিক্‌সের যে পদ্ধতি, মার্কসীয় দর্শনেও সৃষ্টির ডায়লেক্‌টিক্‌সের সেই পদ্ধতি। দৌড় আরম্ভের ও দৌড় শেষের স্থানের অদল বদল, কিন্তু মধ্যেকার দৌড়ের পথটি এক। এবং এই পথেই ডায়লেক্‌টিক্‌সের লীলা অর্থাৎ ডায়লেক্‌টিক্‌সের লীলাই পথ। হেগেলীয় ও মার্কসীয় ডায়লেক্‌টিক্‌সের বিরোধ বাহ্যিক ভাষার বিরোধ। বাস্তবের আন্তরিক মিলে তারা একবস্তু। সৃষ্টি-রহস্যের মূলেই রয়েছে সমাজের পরিণতির মার্কসীয় ভবিষ্যৎ-বাণীর সাফল্যের guarantee। সেই ভরসার তাগিদেই মার্কসের আবিষ্কৃত সামাজিক ডায়লেক্‌টিক্‌স্‌কে বিশ্বসৃষ্টির ডাইলেক্‌টিক্‌সের একাত্ম দেখার আকাংখা। যদি হেগেলের সৃষ্টি-রহস্যের ডায়লেক্‌টিক্‌সের পদ্ধতি মার্কসীয় ডাইলেক্‌টিক্‌সের সঙ্গে এক না হয় তবে মার্কসীয় দার্শনিকদের চিন্তার মূল উদ্দেশ্যই বিফল হয়।

পাঁচ

হেগেলের ডাইলেক্‌টিক্‌সের বিখ্যাত প্রথম ত্রিকটি একটু পরীক্ষা করলে কিছু আলো পাওয়া যাবে।

প্রতিজ্ঞা—Being, বিরোধী প্রতিজ্ঞা—Non-Being, সমন্বয়—Becoming।

কোনও বস্তু কি ব্যাপারকে নামরূপের সীমায় বেঁধে নিশ্চিন্ত হতে না হতেই দেখা যায় যে সেই সীমার মধ্যে একরূপে অবস্থিত পরমার্থের মত তা স্থির থাকছে না। অর্থাৎ যা ছিল তা থেকে সে ভিন্নরূপ নিচ্ছে। যা ছিল তা যদি হয় Being, তবে তার ভিন্নরূপকে বলতে হয় Non-Being। কিন্তু এই Being ও Non-Being, রূপ ও ভিন্নরূপ, দু-এর কোনওটাই নামরূপের অচিদ্র সীমানার মধ্যে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন স্বপ্রতিষ্ঠ বস্তু নয়। রূপেরই পরিবর্তন হচ্ছে ভিন্নরূপে। সুতরাং রূপ ও ভিন্ন রূপের সমন্বয় হচ্ছে এই পরিবর্তমানতা। Thesis বা প্রতিজ্ঞা—Being, Anti-thesis বা বিরোধী প্রতিজ্ঞা—Non-Being, এদের সমন্বয় বা Synthesis হচ্ছে পরিবর্তমানতা—Becoming। কিন্তু এ সমন্বয়ও অ-স্থির। এই রকমে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর সমন্বয়ের ধারা চলেছে যে পর্যন্ত না বিশ্ব ইতিহাসে Absolute বা ব্রহ্মের পূর্ণ প্রকাশে "একরূপেণ অবস্থিতো যোহয়ং সঃ" পরমার্থে —ডাইলেক্‌টিক্‌সের গতির অবসান হয়।

* শ্রীমনোরঞ্জন রায় প্রণীত 'দর্শনের ইতিবৃত্ত', দ্বিতীয় পর্ব, ১২২ পৃষ্ঠা।

দার্শনিক মায়ায় দৃষ্টিবিভ্রম না ঘটলে দেখা কঠিন নয় যে Becoming—Being ও Non-Being এর সমন্বয় নয়, Becomingকে বিশ্লেষণ করেই মানুষের বুদ্ধি Being ও Non-Being পেয়েছে। বাস্তবে Becoming—Being ও Non-Beingএর সমন্বিত রূপ নয়। বাস্তবে আছে Becoming, পরিবর্তমান ঘটনা। সেই Becomingকে নিজের আয়ত্তে আনার জন্যই মানুষ বুদ্ধির কাঠামে তাকে দু ভাগ করে দেখে। বক্র রেখার দৈর্ঘ মাপতে তাকে বহু ছোট ছোট সরল সমষ্টি ধরে নিলে মাপার সুবিধা হয়। কিন্তু বাস্তবে বক্র রেখা বক্র রেখাই, সরল রেখার সমষ্টি নয়। নিজের প্রয়োজনে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে মানুষের বুদ্ধি প্রয়োজনের অনুকূল যে সব উপাদানে তাকে ভাগ-বিভাগ করে দেখে বাস্তবের সেই কল্পিত মূর্তি প্রয়োজনের সীমার মধ্যে সত্য মনে করলে প্রয়োজনসিদ্ধি সুসাধ্য হয়। কিন্তু তার বাইরে তাকে বাস্তবে সত্য মনে করলে কেবল বুদ্ধির riddles বা ধাঁধার সৃষ্টি হয়। অতি মন্দগতি শামুক দু হাত এগিয়ে থাকলে তড়িৎ-গতি অ্যাকিলিস দৌড়ের প্রতিযোগিতায় কি করে তাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে, দেশ ও কালের বিভাজ্যতা যখন অনন্ত? পরমাণুর অণুবিভাজ্যতা স্বীকার করতেই হবে, নইলে পর্বত ও সরষে কণার সম-পরিমাণত্ব এড়ান যায় না। এ সব কৌতুক-রহস্যের সৃষ্টি হয়, যা ব্যবহারিক ও আপেক্ষিক তাকে পারমার্থিক চরম সত্য জ্ঞানে বিচারে প্রবৃত্ত হলে। এক বস্তুর উপর ভিন্ন বস্তুর অধ্যাস মায়া ও মিথ্যা জ্ঞানের মূল।

ডায়লেক্‌টিক্‌সের পদ্ধতি সৃষ্টির পদ্ধতি নয়, সৃষ্টিকে বুদ্ধির আয়ত্তে আনার প্রয়োজনে মানুষের মনের পদ্ধতি। অখণ্ড এককে খণ্ডত্বের বহুত্বে পরিণত না করলে মানুষের কাজ চলে না, কি বুদ্ধির কাজ কি সাংসারিক কাজ। তাই বলে বাস্তবে এক-অখণ্ড বহু খণ্ডের সমষ্টি নয়। কিন্তু হেগেলের ডায়লেক্‌টিক্‌স এ বিতর্কে টলে না। তাঁর দর্শনের credo হলো যা মননের পদ্ধতি তার-ই বহিঃপ্রকাশ সৃষ্টি ও সৃষ্টির পদ্ধতি। কিন্তু 'বস্তুবাদী' মার্কসীয় দার্শনিকেরা হেগেলের এই ভাববাদ স্বীকার করতে পারেন না। তাঁদের কি উপায়? উপায় খুব সোজা। হেগেলের দর্শনের credoকে উল্টে নিয়ে মার্কসীয় দর্শনের credo করলেই হ'লো। বাইরের সৃষ্টি মানুষের মনের আয়নায় প্রতিফলিত হয়। এই প্রতিফলিত ছবিই মানুষের মনন, চিন্তা বা ভাব। সুতরাং মননের পদ্ধতি যদি হয় ডায়লেক্‌টিক্‌ তবে প্রকৃতির সৃষ্টির পদ্ধতিও হবে ডায়লেক্‌টিক্‌। নইলে মনে সে ডায়লেক্‌টিক্‌ আসে কেমন করে?

মার্কসিষ্ট দর্শনের স্বরূপ থেকে এই উৎপত্তির অনুমান সহজ। কিন্তু অনুমান নিষ্প্রয়োজন। মার্কসিষ্ট দর্শনের আদি-দার্শনিক এঙ্গেলস্‌এর কথা একটু তুলে দিচ্ছি—

"ডায়লেক্‌টিক্‌সের নিয়মগুলি প্রকৃতি ও মানুষের সমাজ এ দু-এর ইতিহাস থেকে নিষ্কাশিত। কারণ এ নিয়মগুলি এই দুই ঐতিহাসিক ও চিন্তার বিবর্তনের সব চেয়ে সাধারণ নিয়ম ছাড়া আর কিছু নয়। ... এ সব নিয়মই হেগেল তাঁর ভাববাদী কায়দায় চিন্তা বা মননের নিয়মরূপে উদ্ঘাটন করেছেন। ... তাঁর ভুল এই যে তিনি এ নিয়মগুলি প্রকৃতি ও মানুষের ইতিহাস থেকে অনুমিত নিয়ম মনে না ক'রে চিন্তার পদ্ধতিরূপে সেই ইতিহাসেরই ঘাড়ে চাপিয়েছেন এই নিয়মগুলির

আলোচনায় হেগেলের কষ্টকল্পনা ও টানা-হেঁচড়ার মূল এইখানে। বিশ্বসৃষ্টিকে গায়ের জোরে একটা চিন্তা-পদ্ধতির অনুরূপ দেখাবার চেষ্টা যা মানুষী-চিন্তার বিবর্তনের ইতিহাস তার একটা বিশেষ ধাপে সৃষ্টি করেছে। জিনিষটিকে যদি আমরা উল্টে নেই (if we turn the thing round), তবে সব-ই সরল ও সহজ হয়। যে ডায়লেক্‌টিক্‌সের নিয়মগুলি ভাববাদী দর্শনে গুহাহিত রহস্যের মত দেখায়, তা তৎক্ষণাৎ মধ্যাহ্ন দিনের মত সহজ ও সুস্পষ্ট দর্শন হয়।"*

ছয়

জ্ঞানের ব্যাপারে মানুষের মন যে ফটোগ্রাফিক প্লেট নয়; নানা তাগিদে, বিশেষ জৈব প্রয়োজনের তাগিদে, মানুষের মন যে বহিঃপ্রকৃতির অনুভূতিকে তার কার্যসিদ্ধির অনুকূল নানা আকার দিয়ে গ'ড়ে তোলে, এবং সেই মনগড়া জ্ঞানকে মন-নিরপেক্ষ প্রকৃতিতে আরোপ করে—সাম্প্রতিক কালে ফরাসী দার্শনিক বের্গসোঁ তার বিশদ আলোচনা করেছেন। কিন্তু বের্গসোঁ বুর্জোয়া, সুতরাং প্রতিক্রিয়াশীল দার্শনিক। মার্কসপন্থীদের হারাম। তাঁর কোনও চিন্তা সত্যের বিকৃতি না হয়ে পারে না, কারণ জ্ঞানে বা অজ্ঞানে সে চিন্তা পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থার সমর্থক হবেই হবে।

মানুষের মনকে ইস্পাতের জালে ঘিরে একদিকে ছাড়া অন্য সব দিকে তার গতি রুদ্ধ করার প্রকৃষ্ট সর্বনাশা উপায়। পদ্মকে সুদৃশ্য সুগন্ধ স্বীকার করা চলবে না, কারণ মূল তার কাদায়।

ডায়লেক্‌টিকের পদ্ধতি যদি সৃষ্টির পদ্ধতি হ'তো তবে সে ইলেক্‌ট্রিক টর্চের আলোতে বিজ্ঞানীরা এতদিন অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করে ফেলতেন। কিন্তু কোনও বিজ্ঞানী এ রকম কাজ করেছেন বলে শোনা যায় নাই। এঙ্গেলস্‌ একটা উদাহরণ দিয়েছেন। রুশ রসায়নাচার্য মেন্ডেলিয়েফ্‌ না-কি তাঁর periodic law আবিষ্কার করেছিলেন নিজের অজান্তে হেগেলের ডায়লেক্‌টিক্‌সের এই সূত্রটি মেনে যে, বস্তুর পরিমাণগত পরিবর্তন বাড়তে বাড়তে হঠাৎ তার গুণগত পরিবর্তন হয়। বিজ্ঞানে কাকে বলে বস্তু, কাকে বলে পরিমাণ, কাকে বলে গুণ তার বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। কিন্তু 'অজান্তে' করেছিলেন কথার নির্গলিতার্থ এই যে মেন্ডেলিয়েফ্‌ এ আলোতে আবিষ্কার করেন নাই। করেছিলেন অন্য রকম চিন্তায় চালিত হয়ে। এঙ্গেলস্‌ কল্পিত ৮৬টি রুশ রাসায়নিকের ঘাড়ে চাপিয়েছেন। সৌভাগ্যের কথা যে হালের মার্কসপন্থী রাষ্ট্রগুলির বিজ্ঞানীরা বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টায় ডায়লেক্‌টিক্‌সের বাঁধা সড়কে চলছেন না। বুর্জোয়া দেশের বিজ্ঞানীদের মত-ই বিজ্ঞানের ঋজু, কুটিল, বাঁধা, মেঠো বিশেষ বিশেষ পথেই চলেছেন। যে সব পথ বিজ্ঞানের প্রয়োজনে নিজেদের-ই তৈরী করতে হয়; পূর্বে থেকে বিশ্বসৃষ্টি রহস্যজ্ঞ ঋষিরা তৈরী করে রাখেন নাই। তার এক কারণ অবশ্য যে অনেক বিজ্ঞান-ই দৃষ্টফল। ফল যদি না পাওয়া যায় তবে পরম পবিত্র পথকেও নমস্কার করে বিজ্ঞানীদের অন্য পথে চল্‌তে হয়। মার্কসিষ্ট রাষ্ট্রনেতাদের বাধা দেবার উপায় নাই। কারণ ফলের লোভ তাঁদের-ই সব চেয়ে বেশী।

মার্কস্‌ মানব-সমাজের ক্রম-পরিবর্তনের যে নিয়ম দেখেছিলেন, এবং যার উপর তিনি তাঁর

* এঙ্গেলস্‌এর 'Dialectics of Nature'। ১৯৪০ সালের ইংরেজী অনুবাদ—১৬-২৭ পৃঃ।

'বহুজন হিতায়' সমাজ-বিপ্লবের কর্ম-পদ্ধতির খসড়া করেছিলেন, তা জড় প্রকৃতির সৃষ্টি-পদ্ধতির ডায়লেক্‌টিকাল অভায়লেক্‌টিকাল রূপের উপর কিছু মাত্র নির্ভর করে না। তার মূল নিপীড়িত মানুষের প্রতি মার্কসের মনে মৈত্রী ও করুণা। সে মৈত্রী ও করুণার ডায়লেক্‌টিকাল ব্যাখ্যা কোনও মার্কসিষ্ট দার্শনিক করেছেন কিনা জানিনা। এঙ্গেলস্ সত্য কথাই বলেছিলেন যে মার্কস প্রতিভাবান। তাঁর সহগামী ও অনুগামীরা বুদ্ধিমান মানুষ মাত্র। প্রতিভার এক পরিচয় কার্য-সিদ্ধির জন্য যা অবান্তর তার উপর ঝোঁক না দেওয়া। বুদ্ধিমান চেলারাই গুরুর বাক্যকে বিশ্বগ্রাসী করার লোভে তাকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে অবাস্তবের সীমায় নিয়ে যায়।

অপেক্ষার দীপ

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

হৃদয়ে জ্বালিয়ে রাখো অপেক্ষার দীপ।
দ্রষ্টার নির্মোহ চোখে জেগে থাকো আপাততঃ রাত্রির প্রহরী ;
মৌনের পাষাণে দেখো ভেঙ্গে যাবে কত রূপ বিলোল ছলনা,
মোহভঙ্গে ফিরে যাবে রূপপ্লাবী আনত শর্বরী !
সুবর্ণ হৃদয়ে জ্বালো অপেক্ষার দীপ ঃ

আগে তার বিলসিত যৌবনের উদ্ধত প্রাসাদ
বিচূর্ণিত ছিন্নসুরে ঝরুক, ঝরুক ;
সে যেন একান্ত-একা ছায়া দেখে অন্তহীন কাঁদে !
যেহেতু নিজেকে চেয়ে সে শুধু ঝরেছে ফুলে মেঘে—
নিজেকে দেয়নি, তাই তার মন একা-অন্তরীণ !
তাই আগে তার কান্না ফিরে যাক অগ্নি রুচি তপে
পার্ব্বতীও ফিরে গেছে। বসন্তের ষড়যন্ত্র ছিল সেই দিন !

প্রণয়ের পুণ্যলীন পঞ্চতপা হোমের বিভাসে।
পঞ্চাগ্নির দুঃখ-দাহ শেষ হলে কোন এক বিতন্দ্রিত স্বর
ধ্যান ভাঙ্গে পার্ব্বতীর। অন্ধকারে আরাধিত ধূপ।
অপর্ণা সুবর্ণ দীপ জ্বেলে দেখে হাসে মহেশ্বর।

কপোতের প্রার্থনা

অনিরুদ্ধ কর

আমাকে অশান্তি দাও। শান্তির নিশ্বাসে তুমি আর
স্থবির চুম্বন দিয়ে আমাকে অথর্ব্বে জড়িও না,
পক্ষাঘাত দিয়োনাকো আমার ডানায়। বার বার
ক্লীবকল্প কামনায় শান্তিকে এখানে পাঠিও না
হে ঈশ্বর।

এ-নিশিত রোদের সাগরে ভাসমান
ডানা তুমি সুশাশ্বতী আবেগেই করো স্বপ্নলীনা ঃ
আদিম শপথে সে যে খুঁজে নেবে অমৃত-সন্ধান।

ক্লীবকল্প কামনায় শান্তিকে এখানে পাঠিওনা
অক্ষম বিলাসে ;

নীর-মরীচির জাতক মায়াতে
সর্ব্বাঙ্গ জড়ায়ে তার,—কী নিরন্ধ্র বাহুড়-ছায়াতে !

অনির্বচনীয়

হেনা হালদার

আমি কী কখনো ভেবেছি, আবার কেউ
কোনোদিন এসে তুলবে এমন ঢেউ
মনের শুকনো সাগর বেলার বুকে ?
তার কামনার রঙে রাঙা কৌতুকে
আকাশ আমার গোধূলি-মদির হবে
সব অবকাশ ভরে যাবে সৌরভে ?

—তুমি মন ভরে দিয়েছ অসীম দানে
এতটুকু ফাঁক রাখনি যে কোনো খানে।
পদাতিক এই জীবনের ম্লান গলি
ঢেকে দিলে তুমি, শুভ্র কুন্দ কলি
মুঠো মুঠো করে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ভরে।
—তোমার এ ঋণ শুধবো কেমন করে ?

আমার রাত্রি করেছ কী-উতরোল ;
বন্যার মত আনন্দ-কল্লোল
প্লাবিত করেছে দীর্ঘ-তৃষিত প্রাণ,
কী করে যে দিলে অমর্ত্য-সন্ধান !
স্বপ্ন-মায়ায় ভরলে আঁখির নীড়
মিহি তারে-তারে তুলেছ সূক্ষ্ম মীড়।

নিজেকে পেলেম ; তোমাকেও সেই সাথে
আমার দু'আঁখি ঢেকেছি ও-দুটি হাতে ॥

কী বলবে

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

কী বলবে জানি না আমি। শুধু বলি, নিশি মূক হলে
নক্ষত্রের রূপজ্যোতি দূরে ঠেলে চলে এস এ-জ্যোতির্মণ্ডলে
অতন্দ্র অরণ্যে অন্ধকারে।
দূর তটিনীর নৃত্য নূপুরের হাসির সম্ভারে
ভেসে আসবে। শুধু বলি, নিশি স্তব্ধ হোক
অজস্র পাতার কান্তি হয়ে যাক রাত্রিঢালা অপূর্ব্ব আলোক!

দৃষ্টির নেপথ্যে আমি দীর্ঘরাত্রি জেগে থাকব: জোনাকির গোপন বাসরে
শূন্যতার তিক্ত ঢেউ তুচ্ছ করে ধ্যানশান্ত তাপসের মত
ধ্রুবতৃপ্তি অনুধ্যানে। নিশাচর জ্যোস্না অবিরত
বিরহের ব্যথা-ব্যর্থ স্মৃতি আনবে অফুরন্ত কান্নার অক্ষরে,
অনির্বাণ নির্বেদের বেদনায়। আমি তবু ক্লান্ত চোখে অন্য আলো ঢেলে
রজনীর দীর্ঘযামে নীরবে গোপনে
জেগে থাকব। অন্তহীন শিশির ঝরার আর্তি হয়তো অকারণে
অশ্রু আনবে। আমি তবু বসে থাকব প্রতীক্ষার দৃপ্ত দীপ জ্বেলে!

অকস্মাৎ একদিন রাত্রির সাগরে ঢেউ তুলে
সে এল: নিশ্চুপ, শান্ত, সন্ত্রস্ত। মুহূর্ত্তে রক্ত বক্ষে বক্ষে দুলে
নিস্তব্ধ সঙ্কেতকুঞ্জ ভরে দিল গাঢ়বদ্ধ নিশ্বাসে নিশ্বাসে।
তীব্র কৌতূহলে
জিজ্ঞাসার চোখ মেলে দেখি তারও দৃষ্টিতে উথলে
ভাষাহীন লক্ষতারা। আমি-সে তৃষার্ত পাখি জলদের নীরব আশ্বাসে
(কী বলবে জানি না আমি) যত বলি, বলো, আজও বলো—
শ্যাম অরণ্যের পরে তীব্রদৃষ্টি রাত্রির অঞ্চল-ও
রহস্যে রভসে কাঁপে; বলে চুপে: কী বলব, জানি না আজও মনে!

শুধু ক্লান্ত পাখি এক মেঘেরে জড়ায়ে ধরে সুতীব্র সুচির আলিঙ্গনে!!

মরণের পরে

সি জি রসেটি

মরণের পরে ওগো প্রিয়তম
গেয়োনাকো কোন গান;
গোলাপের কুঁড়ি রেখোনা শিয়রে,
ঢেকোনা কবরখান।

মোর 'পরে রবে সবুজ তৃণের
শিশির সজল বাস,
মনে রেখো যদি মনে আসে মোরে
ভুলো যদি হই অপ্রকাশ।

মোর তরে আর রবে না আঁধার
রবে না বৃষ্টিকণা;
দোয়েলের সুর কোথা হবে লীন
কোথা যাবে সে বেদনা

স্বপ্নমাখা সে গোধূলি আলোয়
উদয় ও অস্ত বিনে,
হয়ত তোমায় মনে রবে প্রিয়
হয়ত রবে না মনে।

অনুবাদ: দিব্যেন্দ্রনাথ মিত্র।

ঘড়ি

চার্লস্ বোদলেয়র

চীন দেশের লোকেরা সময় বলে বেড়ালের চোখ দেখে।
নান্‌কিংএর পল্লী অঞ্চলে ঘুরছিলেন এক মিশনরী,
দেখলেন যে তিনি তাঁর ঘড়িটি ফেলে এসেছেন।
একটি ছোট্ট ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন—সময় কতো?
গোড়ায় ইতস্তত করতে লাগলো স্বর্গীয় সাম্রাজ্যের এই ছেলেটি।
পরে মনের ভাব সাম্‌লাতে না পেরে বল্লে—বল্‌ছি তোমাকে সময়।
কয়েক মিনিট বাদে সে ফিরে এলো, হাতে তার একটা প্রকাণ্ড বেড়াল।
বেড়ালের চোখের শাদাটার দিকে তাকিয়ে
একটুও দ্বিধা না করে সে বল্‌লে—এখনো ঠিক দুপুর নয়।
সে ঠিকই বলেছিলো।
সকালেই হোক আর রাত্রি বেলায়ই হোক্,
আলোতে হোক্ আর ঘন অন্ধকারে হোক্,
যখনই আমি আমার সুন্দর বেড়ালটির দিকে তাকাই,
যে বেড়ালটি তার জাতের গৌরব আর আমার প্রাণের গর্ব্ব, মনের সৌরভ,
তখনই তার মনোহরণ নয়নের গভীরতায়
সব সময়ে আমি ঠিক সময় বলতে পারি।
সব সময়েই সেই সময় এক—
একটি অসীম-বিস্তৃত বিরাট গম্ভীর প্রহর,
মিনিট কিম্বা মুহূর্ত্তের দ্বারা খণ্ডিত নয় এমন একটি নিশ্চল চির-স্থির প্রহর
ঘড়িতে যার সন্ধান মেলে না,
তবু যে প্রহর দীর্ঘনিঃশ্বাসের মতো স্বল্প,
চাবুক তোলার মতো তড়িৎ-গতি।
যখন আমি এই চমৎকার ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে আছি
তখন যদি কোনো অবাঞ্ছিত লোক ব্যাঘাত দেয়,

যদি কোনো রূঢ় অসহিষ্ণু অপদেবতা, অশুভ মুহূর্ত্তের কোনো রাক্ষস আমাকে শুধায়
এতো যত্নের সঙ্গে কি তুমি দেখছো? কি খুঁজছো তুমি ওর চোখে?
সময়ের বাজে খরচাকারী, অকেজো তুমি,
তুমি কী সময় দেখো ওর চোখে?
একটু দ্বিধা না করে আমি বল্‌বো—
হাঁ, আমি সময় দেখি—দেখি অনন্ত।
ওগো নারী, এটা কি একটা যোগ্য প্রেমের কবিতা নয়,
তোমারি মতো ভঙ্গীতে ভরা কবিতা?
এতো আনন্দ পেয়েছি আমি
প্রেমের এই পালিশ-করা কথাগুলির নক্‌সা বুনতে,
যে এর বদলে কিছুই চাইবো না আমি তোমার কাছে॥

অনুবাদ: সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বলেন্দ্রনাথের গদ্যরচনা

রথীন্দ্রনাথ রায়

প্রথম পর্যায়

১

রবীন্দ্রযুগে এবং রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমসাময়িকদের মধ্যে গদ্যরচনার ক্ষেত্রে তিনজনের নাম উল্লেখযোগ্য—প্রমথ চৌধুরী, বলেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ। এই তিনজন লেখকেরই খ্যাতি বিষয়-বিস্তারের জন্য নয়, তাঁদের খ্যাতি বাংলাগদ্যরীতির অভিনব-কর্ষণার ওপরেই নির্ভরশীল। মননশীলতা, মৌলিক চিন্তা প্রভৃতি গুণের অভাব নেই, কিন্তু এইটুকুই তাঁদের রচনা সম্পর্কে শেষ কথা নয়, এমন কি সম্ভবতঃ প্রধান কথাও নয়। বাংলা গদ্যরীতির কর্ষণার ক্ষেত্রে এই তিনজনের নামই উল্লেখযোগ্য। প্রমথ চৌধুরী বাংলাগদ্য রচনার ক্ষেত্রে অনন্য—নূতন ধরণের মিতবাক-পদ্ধতি, কথ্য ভাষায় ঋজু-সংহত দীপ্তি, পরিচ্ছন্নতা ও তীক্ষ্ণধার ব্যঙ্গ-রসিকতা প্রমথ চৌধুরীর গদ্যরীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বক্তব্য অপেক্ষাও বলার রীতিই সেখানে বড়। অবনীন্দ্রনাথের গদ্যরচনারও একটি নিজস্ব রূপ আছে—সে রীতি যেন ষ্টিলের কলমের পক্ষে সম্ভব নয়, সে রীতি রঙের ও রেখার। রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির সঙ্গে এই দুইজন কৃতকর্মা গদ্যলেখকের পার্থক্য প্রচুর। স্বল্পায়ু বলেন্দ্রনাথের পক্ষে ঠিক এ কথা বলা চলে না, বলেন্দ্রনাথের রচনারীতি রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের গদ্যরচনারীতির অনেকখানি অনুগত—যদিও তাঁরও কতকগুলি নিজস্ব ক্ষেত্র ছিল। প্রমথ চৌধুরী ও অবনীন্দ্রনাথ দু'জনই দীর্ঘজীবী ছিলেন, তাঁদের রচনারীতির একটি সুপরিণত আদর্শ চোখে পড়ে—তাছাড়া গদ্যরীতির একটি দীর্ঘকালসাপেক্ষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিচিত্র স্তরপরম্পরা এই দুই খ্যাতকীর্তি গদ্যলেখকের রচনায় সুপরিস্ফুট। বলেন্দ্রনাথ দীর্ঘজীবী ছিলেন না, কিন্তু মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সেই অসাধারণ প্রতিভাবলে অল্প সময়ের মধ্যেই পরিণতির কয়েকটি বড় বড় ধাপ অনায়াস-সাচ্ছন্দে অতিক্রম করেছিলেন। উনত্রিশ বছরের প্রমথ চৌধুরী ও অবনীন্দ্রনাথের কথা চিন্তারও বাইরে—অথচ এই স্বল্পকালের মধ্যেই কবিতা ও গদ্যের উভয়বিধ ক্ষেত্রেই বলেন্দ্রনাথের নিজস্ব ভাবনা ও বিশিষ্ট স্টাইলের একটি প্রৌঢ়ত্ব সুস্পষ্টগোচর। বলেন্দ্র-প্রতিভার এই সহজ-প্রৌঢ়ত্ব প্রসঙ্গে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর এক সময় বলেছিলেন: "বয়সে বালকত্ব অতিক্রম করিবার পূর্বেই তিনি প্রৌঢ়ের দুর্লভ অন্তর্দৃষ্টির ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার শেষের দিকের রচনা হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।"

ইংরেজীতে একটি প্রসিদ্ধ উক্তি আছে—"Style is the man himself."—এই উক্তিটির প্রয়োগগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নানা বিতর্কের অবকাশ আছে। কিন্তু একথা যথার্থ যে একটি ষ্টাইলের

অধিকারী হওয়া সহজ নয়—কারণ ষ্টাইল কথাটির মধ্যেই রচয়িতার ব্যক্তিত্বটি সুমুদ্রিত। ষ্টাইলের ভিত্তিমূলে ব্যক্তিত্বের কঠিন শিলাস্তর, এবং সেইখানেই যথার্থ প্রাণশক্তি। আবার অন্যদিকে বক্তব্যের সঙ্গেও ষ্টাইলের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। বক্তব্য ও বলার রীতি এই দুয়ের অদ্বৈত-সম্পর্কের কথাও শ্রেষ্ঠ ষ্টাইল প্রসঙ্গে প্রযোজ্য। কিন্তু শ্রেষ্ঠ ষ্টাইল ব্যক্তিগত হয়েও সার্বজনীন। এইখানেই শ্রেষ্ঠ ষ্টাইলের যথার্থ পরিচয়-চিহ্ন: "Style in this absolute sense is a complete fusion of the personal and the universal."—বলেন্দ্রনাথের রচনারীতির স্তর তিনটি। বালক বয়সের গদ্যরচনাগুলিতে অশরীরী বাসনা-কুহেলিকার বর্ণগন্ধ-ঘন আস্তরণ ভেদ করে ব্যক্তিত্ব-দ্যোতনার কোন অবকাশ ছিলনা, ভাষার বাঁধুনি কখনও অনায়ত্ত, একটু বেশীমাত্রায় "সেন্টিমেন্ট্যাল"। এইস্তরের অধিকাংশ রচনাই ষোলো বছরের মধ্যে লেখা। "চিত্র ও কাব্য" গ্রন্থটির মধ্যে দ্বিতীয় স্তরের প্রকাশ। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ও ললিতকলার সমালোচনা-গ্রন্থটিতেই সর্বপ্রথম একটি বিশিষ্ট ষ্টাইল চোখে পড়ে—রচয়িতার ব্যক্তিত্বের ছাপ এখানে সুস্পষ্ট,—হৃদয়ের অনেকখানি অংশই যেন ধরা দিয়েছে। বলেন্দ্রনাথের বয়স তখন বাইশ থেকে চব্বিশের মধ্যে। তাঁর ষ্টাইলের সর্বোচ্চ স্তর স্বল্পায়ু,—কিন্তু এই অংশেই Complete fusion of the personal and universal-এর যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায়, সেটুকুরও মূল্য কম নয়। কারণ "চিত্র ও কাব্য" গ্রন্থেই বলেন্দ্রনাথের ষ্টাইলের সর্বোচ্চ স্তরের সূত্রপাত, কিন্তু বলেন্দ্র-সুলভ রচনারীতির চরমোৎকর্ষ খুব বেশী রচনায় নেই—সত্যেন্দ্রনাথের 'পরমায়ুটুকু পেলেও সম্ভবতঃ তিনি তাঁর গদ্যরীতির সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করতে পারতেন।

বলেন্দ্রনাথের প্রায় সব রচনাই "বালক," "ভারতী ও বালক" এবং "সাধনা" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বলেন্দ্রনাথের গদ্যরচনা আলোচনার পক্ষে এই পত্রিকাত্রয়ীর পটভূমিকা বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল। বিশেষতঃ এই পর্বে পিতৃব্য রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনা বলেন্দ্রনাথের গদ্যরচনাকে এক সৌন্দর্যের মোহমন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল। "ভারতী-সাধনা" পর্বে রচিত রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনা সমূহের বৈশিষ্ট্য নানাকারণে উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে প্রাক্-সবুজপত্র যুগের রচনার শ্রেষ্ঠ অধ্যায় এই পর্বে। এই পর্বের কয়েকটি প্রতিনিধিস্থানীয় গদ্যরচনাকে পাশাপাশি রাখলেই বলেন্দ্রনাথের গদ্যরচনার প্রেরণা ও সিদ্ধির ইতিহাস আলোচনা করা সহজসাধ্য হবে। রাজসিংহ (১৩০০), মেঘদূত (১২৯৮) কেকাধ্বনি, নববর্ষা (১৩০৮) পঞ্চভূতের ডায়েরী (১৩০১) ক্ষুধিত পাষাণ (১৩০২), নিশীথে (১৩০১), প্রভৃতি গদ্যরচনাগুলি বলেন্দ্রনাথের গদ্যরচনার আদর্শ হিসেবে মনে করা অসঙ্গত হবে। প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থ বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুর অনেককাল পরে গ্রন্থকারে মুদ্রিত হলেও, এর প্রায় সবগুলি রচনাই বলেন্দ্রনাথের জীবিত কালে লিখিত। বলেন্দ্রনাথের স্বল্পপ্রসারী জীবনের সাহিত্য-সাধনা ছাড়া দু'টি বৃহত্তর কর্ম্মযোগের কথা আছে: প্রথমটি "আর্যসমাজ" ও "ব্রাহ্মসমাজ"এর মিলন-প্রচেষ্টায় পাঞ্জাব যাত্রা; দ্বিতীয়টি, রবীন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথের সহযোগিতায় স্বদেশী দ্রব্য বিক্রয়ের উদ্যোগ। এই দ্বিতীয়টির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সংযোগ ঘনিষ্ঠতর। জীবনের শেষ পাঁচ-ছ বছর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর একটি ঘনিষ্ঠতর আত্মিক যোগসূত্র রচিত হয়েছিল। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "নদী" কাব্যটি বলেন্দ্রনাথকেই উৎসর্গ করা হয়েছিল। বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুকাল (১৮৯৯) রবীন্দ্র-

জীবনের পক্ষে একটি কর্ম-চঞ্চল প্রহর। প্লেগ-আতঙ্কিত কোলকাতায় ভগিনী নিবেদিতার সাহায্যে দুর্গতদের জন্য সাহায্য-তহবিল, সেবা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা, ঢাকায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগদান করা, অন্ধকবি হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের জন্য সাহায্য-তহবিল সৃষ্টি করা প্রভৃতি কর্ম-চঞ্চল বৃহত্তর আদর্শ-উন্মাদনার দিনে ঐ বছরের বাইশে অগাষ্ট বলেন্দ্রনাথের মৃত্যু হলো, এবং—"The business interprises run ill. Rabindranath winds up the jute business, taking upon himself the entire financial liabilities, which take him years to repay"১—সুতরাং বলেন্দ্রনাথের শেষ ক'বছর ব্যবহারিক ও আত্মিক যোগসূত্রে রবীন্দ্রমানসের নিকটতম প্রতিবেশী হয়েছিলেন। সাবলীল অথচ সহজ গদ্যরীতি, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের আনুগত্য, প্রগাঢ় সৌন্দর্যবোধ, বিদেশী শিক্ষা-মোহমুক্ত স্বাদেশিকতা প্রভৃতি বলেন্দ্রনাথের দুর্লভ গুণাবলীর প্রকৃত দীক্ষাগুরু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। মনোধর্মের দিক থেকে বোধহয় রবীন্দ্র-শিষ্যদের মধ্যে বলেন্দ্রনাথই রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে নিকট-সহচর।

২

গদ্য ও কবিতা উভয়ক্ষেত্রেই বলেন্দ্রনাথের পারদর্শীতা ছিল, কিন্তু গদ্যরচনাগুলিই তাঁর প্রতিনিধিস্থানীয় সাহিত্যসৃষ্টি, এখানেই যেন তাঁর প্রতিভার পূর্ণতর অভিব্যক্তি। তাঁর গদ্যরচনাগুলির পরিধি ও বিষয়-বিস্তারও কম নয়। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে তাঁর কল্প-মধুকরীর অনায়াস-সঞ্চরণ। তাঁর সমগ্র গদ্যরচনাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় : (ক) শিল্প-সাহিত্য সমালোচনা, (খ) ব্যক্তিগত প্রবন্ধ, (গ) ঐতিহাসিক-স্মৃতিমূলক প্রবন্ধ, (ঘ) সামাজিক প্রবন্ধ, (ঙ) আচার-আচরণ ও দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্ম-সম্পর্কিত প্রবন্ধ। কিন্তু শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কিত সমালোচনাগুলিই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা, তাঁর রচনাবলীর প্রায় অর্ধাংশই এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

শিল্প-সাহিত্য সমালোচনার একটি প্রধান অংশই সংস্কৃত সাহিত্যের বিখ্যাত কাব্য-নাটক সমূহের আলোচনা, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি মূল্যবান আলোচনাও এক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সাহিত্য ছাড়া চিত্র-সমালোচনাও তাঁর প্রচুর—সম্ভবতঃ বলেন্দ্রনাথই বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম সার্থক চিত্র-সমালোচক। তাঁর মনোজীবনের সঙ্গে এই জাতীয় সমালোচনার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। সংস্কৃত সাহিত্যের বর্ণ-দীপ্ত বর্ণনা ও চিত্রচারণা বলেন্দ্রনাথের গদ্যরীতিকে প্রভাবিত করেছিল। এই হিসেবে তাঁর "চিত্র ও কাব্য" (১৮৯৪) গদ্যগ্রন্থ, "মাধবিকা" (১৮৯৬) ও "শ্রাবণী" (১৮৯৭) কাব্যগ্রন্থদ্বয় থেকে পূর্ণতর। "চিত্র ও কাব্য" তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ হলেও বলেন্দ্রনাথের চিত্রধর্মিতা, রঙ ও রেখার বর্ণাঢ্যতা, সুচিক্কণ কাব্যধর্মী বাণী-বিন্যাস ও সৌন্দর্য-চেতনা প্রভৃতি তাঁর গদ্যরীতির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য এই গ্রন্থের কয়েকটি রচনার মধ্যেই সুচিহ্নিত। উত্তরচরিত, কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা, কাব্যে প্রকৃতি, পশুপ্রীতি, মৃচ্ছকটিক, মালবিকাগ্নিমিত্র, মেঘদূত, রত্নাবলী, ঋতুসংহার প্রভৃতি সংস্কৃত সাহিত্যের খ্যাতকীর্তি কবি ও কাব্যের আলোচনায় বলেন্দ্রনাথ উদার রসবোধ ও

১। A Tagore Chronicle : Visva-Bharati Quarterly, May—Oct, 1941.

বিচার-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। প্রাক্-রবীন্দ্রযুগে ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ বসু, কালিপ্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতি বিখ্যাত সাহিত্যসমালোচক ও প্রবন্ধকার সংস্কৃতসাহিত্যের আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "প্রাচীন সাহিত্য" গ্রন্থে এবং অন্যান্য বহু রচনায় পুরাতনী কবি-প্রজ্ঞার আলোচনা করেছেন। কিন্তু এই দুই বিশিষ্ট পর্বের মধ্যে আলোচনার পার্থক্য আছে। বঙ্কিমচন্দ্র অথবা ভূদেবের আলোচনা অপেক্ষাকৃত বস্তুনিষ্ঠ ও বিষয়মুখী আলোচনা—আলোচ্যগ্রন্থ বা কবি-চরিতই এখানে মুখ্য অবলম্বিত বিষয়। বঙ্কিমের সমালোচনার ভাষা ও উপন্যাসের ভাষার মধ্যে পার্থক্য আছে। সমালোচনার ভাষা তীক্ষ্ণাগ্র, নৈয়ায়িক বিশ্লেষণে যুক্তিনিষ্ঠ—রসবোধ ও পাণ্ডিত্যের সংগমতীর্থ। উপন্যাসের ভাষার লালিত্য, নমনীয়তা ও কাব্যাচরণ এখানে অনুপস্থিত। রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত কাব্যনাটক আলোচনার ধারা স্বতন্ত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনা বস্তুনিষ্ঠ, যুক্তি-নির্ভর—তার বিষয়মুখীনতা একমুখ-নিয়ন্ত্রী। রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা আত্মনিষ্ঠ, অনেকখানিই যেন তাঁর নিভৃতচারী কবিমনের রচনা—প্রাচীন সাহিত্য সমালোচক রবীন্দ্রনাথ অনেকটা ইম্‌প্রেশ্যানিষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্র উত্তরচরিত ও শকুন্তলা সমালোচনা প্রসঙ্গে সাহিত্যের মূলতত্ত্বের সমীপবর্তী হয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ সমগ্রভাবে আলোচনা করতে গিয়ে রসস্পন্দনের রূপ-রেখায় নূতন একটি রূপ সৃষ্টি করেছেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন কবি-মনীষা কবির রস-মন্থর বাসনালোকে যে মুগ্ধস্পন্দী আন্দোলনের সৃষ্টি করেছে তারই রূপময় কবিভাষ্য রচনা করেছেন। বলেন্দ্রনাথ প্রাচীন সাহিত্য বিচারে রবীন্দ্রপন্থী।

"কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা" আলোচনা প্রসঙ্গে কালিদাসের খণ্ডচিত্র ও তার অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে মননশীল আলোচনা করেছেন : "এইরূপ খণ্ড খণ্ড চিত্র এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারুকৌশলের প্রতি কবির বিশেষ দৃষ্টি থাকাতে অনেক সময় বৃহৎ চিত্ররচনায় তিনি সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইতে পারেন না। সমুদ্র পর্বতের ন্যায় প্রকৃতির বিরাট দৃশ্যে কবি যদি এক মুহূর্তে দৃশ্যের সমস্ত বৃহত্ত্ব চক্ষের সমক্ষে খাড়া করিয়া না তুলিতে পারেন, তবে যে চিত্রই ব্যর্থ হয়। কারণ বিরাটত্বই তাহার প্রধান ভাব ; তাহার খণ্ড খণ্ড আংশিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিকে প্রাধান্য দিলে তাহার প্রকৃত ভাবটাকেই খর্ব করা হয়।" প্রাচীন সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথও "কাদম্বরী চিত্র" সমালোচনায় কালিদাসের শ্লোকসমূহের বিচ্ছিন্নতা অথচ মুক্তা-নিটোল সৌন্দর্যের কথা বলেছেন। ব্র্যাডলি-সাহেব কালিদাসের এই খণ্ড চিত্রসমষ্টিকে "বিউটিফুল" বলতেন, কিন্তু নিঃসন্দেহে "সাব্লাইম" বলতেন না (২)। কালিদাস ও ভবভূতি প্রতিভার তুলনামূলক বিচার করতে গিয়ে বলেন্দ্রনাথ বলেছেন : "ভবভূতি যেখানে একটি মাত্র মেঘমন্ত্র সমাসে বিন্ধ্যপর্বতের অন্ধকার অরণ্য সম্মুখে মূর্তিমান করিয়া তুলেন, কালিদাস সেখানে প্রত্যেক লতার এবং ফুলের স্বতন্ত্র আস্বাদটুকু ছাড়িতে পারেন না।" কালিদাস ও ভবভূতির এই তুলনাটি যেন খণ্ডিত, সমগ্রতার অভাব। বঙ্কিমচন্দ্রের তুলনামূলক আলোচনাটি অনেক বেশী পূর্ণাঙ্গ ও মৌলিক চিন্তার পরিচয়বাহী : "কালিদাসের বর্ণনা তাঁহার অতুল উপমাপ্রয়োগের দ্বারা অত্যন্ত মনোহারিণী হয়। ভবভূতির উপমাপ্রয়োগ অতি বিরল ; কিন্তু বর্ণনীয় বস্তু তাঁহার লেখনীমুখে স্বাভাবিক সৌন্দর্যের অধিক শোভাধারণ করিয়া বসে।...ভবভূতি বাছিয়া বাছিয়া মধুর সামগ্রী সকল

একত্র করেন না। যাহা বর্ণনীয়বস্তুর প্রধানাংশ বলিয়া বোধ করেন, তাহাই অঙ্কিত করেন। দুই চারিটা স্থূল কথায় একটা চিত্র সমাপ্ত করেন—কালিদাসের মতো শুধু বসিয়া বসিয়া তুলি ঘষেন না। কিন্তু সেই দুই চারিটি কথায় এমন একটু রস ঢেলিয়া দেন যে তাহাতে চিত্র অত্যন্ত সমুজ্জল, কখন মধুর, কখন ভয়ঙ্কর, কখন বীভৎস হইয়া পড়ে। মধুরে কালিদাস অদ্বিতীয়—উৎকটে ভবভূতি।"

বলেন্দ্রনাথ কয়েকটি প্রবন্ধের মাধ্যমে কালিদাসের প্রতিভার বিস্তৃত আলোচনাই করেছেন। ঋতুসংহার কালিদাসের প্রথম বয়সের রচনা, এই সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নয়। বলেন্দ্রনাথ ঋতুসংহারের সঙ্গে মেঘদূতের বিশ্বপ্রকৃতির তুলনামূলক আলোচনা করে তাঁর এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে যুক্তি দিয়েছেন: "কিন্তু মেঘদূতের সহিত ঋতুসংহারের তাহা হইলে প্রভেদ কোথায়? মেঘদূতও ত আদিরসপ্রধান খণ্ডকাব্য। আর সমস্তটাই বর্ণনাও বটে। কিন্তু প্রভেদ আছে। মেঘদূতে মানবহৃদয়েরই প্রাধান্য। কালিদাস বিরহীর হৃদয়ে বসিয়া, বর্ষার প্রভাব অনুভব করিয়াছেন। ঋতুসংহারে বাহ্যজগতেরই প্রাধান্য।" বলেন্দ্রনাথের মেঘদূত আলোচনাটিতে কোন মননশীলতার পরিচয় নেই। রবীন্দ্রনাথের কবিতা, প্রবন্ধ ও মেঘদূত সম্পর্কিত প্রৌঢ় মন্তব্যগুলির তুলনায় বলেন্দ্রনাথের আলোচনাটি নিতান্ত কাঁচা হাতের লেখা বলে মনে হয়। প্রায় সমসাময়িক কালে রবীন্দ্রনাথের "মেঘদূত" কবিতাটি (১৮৯০) রচিত হয়। রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের মেঘদূতকে অপূর্ব কবিব্যাখ্যা দিয়েছেন—তাই কালিদাসের কাব্যে যা বিরহ-বিলাস, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তা-ই সুচীতীক্ষ্ণ বিরহ-ব্যাখ্যায় রূপান্তরিত হয়েছে—কবি এই কাব্যের মধ্যে পেয়েছেন নিখিল-মানবের চিরন্তন বিরহ।(৩)

মালবিকাগ্নিমিত্র আলোচনায় বলেন্দ্রনাথ শ্রীহর্ষের রত্নাবলী নাটকের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন—প্রবন্ধের শেষদিকে নাটকখানির রচয়িতা ও কালসমস্যা সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করেছেন।

"কাব্যের উপেক্ষিতা" প্রবন্ধের মধ্যে চকিতে একবার এবং "শকুন্তলা" প্রবন্ধে প্রকৃতি ও মানবের প্রীতিমুগ্ধতার বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ ভবভূতি-প্রতিভার মূল্যবান দিক্-নির্দেশ করেছেন, কিন্তু কোথায়ও বিস্তৃত আলোচনা করেন নি। "উত্তররচরিত" প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথ রসজ্ঞ ব্যাখ্যাতার পরিচয় দিয়েছেন। নানাকারণে এই আলোচনাটি অন্যান্য আলোচনা থেকে স্বতন্ত্র। উত্তরচরিতের কোমল-সুকুমার স্নিগ্ধ-নম্র বিগলিত করুণার মূলউৎসটি এই তরুণ সমালোচক তুলে ধরেছেন। উত্তরচরিতের ভাষা ও শব্দ-বিন্যাস নিয়ে বলেন্দ্রনাথ একটি নূতন রসলোক সৃষ্টি করেছেন—প্রবহমান শব্দ-তরঙ্গের সঙ্গে সমালোচক তাঁর আবেগস্পন্দিত কবিকণ্ঠ মিলিয়ে দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরচরিতের আলোচনাটি বিশ্লেষণাত্মক ও বিতর্কমূলক—মাঝে মাঝে অবশ্য রসসৃষ্টির প্রয়াসও আছে—বলেন্দ্রনাথ এখানে জাগ্রতবুদ্ধি বিশ্লেষণ-নির্ভর সমালোচক নন,—তিনি যেন স্বপ্ন-তন্ময়, আবিষ্ট-চিত্ত কবি। বলেন্দ্রনাথের "মৃচ্ছকটিক" ও "রত্নাবলী" সমালোচনা গতানুগতিক। এই দুটি গ্রন্থ সমালোচনায় কোন অন্তর্ভেদী বিশ্লেষণ নেই। "মৃচ্ছকটিক" সমালোচকটির প্রথম দুই অনুচ্ছেদে সামান্য একটু সমাজ-চিত্রের আভাস আছে, কিন্তু ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মতো তত্ত্ব-নিরূপণ করতে বসেন নি। ভূদেবের দৃষ্টি একটু নীতি-নির্দিষ্ট, বলেন্দ্রনাথ সেখানে সহজ সৌন্দর্য-সাধক।

৩

শুধু সংস্কৃত সাহিত্যের নয়, প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের কবি ও কাব্যসম্পর্কেও বলেন্দ্রনাথের রচনার পরিধি কম নয়। কুন্দনন্দিনী ও সূর্যমুখী, কৃত্তিবাস ও কাশীদাস, কেতকা-ক্ষেমানন্দ, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য, বঙ্গসাহিত্য: রামপ্রসাদের গান, বাঙলাসাহিত্যের দেবতা, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস, ভারতচন্দ্র রায়, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি রচনা উল্লেখযোগ্য। বলেন্দ্রনাথের "জয়দেব" প্রবন্ধে দুটি মূল্যবান মীমাংসা আছে: প্রথমটি জয়দেব ও বিদ্যাপতির তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে জয়দেব-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যের উদ্‌ঘাটন করা; দ্বিতীয়টি কাব্যে শ্লীলতা ও অশ্লীলতা সম্পর্কিত আলোচনা। বিদ্যাপতির কাব্যের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করে জয়দেব সম্পর্কে বলেন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত মননিষ্ঠ: "এই সহজপরিতৃপ্ত সঙ্কীর্ণ সম্ভোগবিলাস কতকগুলি চিরপ্রচলিত শরীরসম্বন্ধীয় উপমাসম্বন্ধ হইয়া এক মেরুদণ্ডবিহীন ললিত গলিত ছন্দের উপর ভর করিয়া নিতান্ত পিচ্ছিল কোমল পদাবলীর উপর দিয়া স্খলিত ও লুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।"—প্রেমের ভাবরূপ বিশ্লেষণে বলেন্দ্রনাথ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। জয়দেবের ইন্দ্রিয়-সর্বস্বতার আলোচনাটি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একটি মূল্যবান মীমাংসার ইঙ্গিতবহ: "গ্রীসীয় নগ্ন প্রস্তরমূর্তি দেখিয়া কেহ ত অশ্লীল বলেনা। প্রকৃতির অন্তর হইতে সেই নগ্নগঠন যেন স্বভাবতই অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাহার আবরণ নিষ্প্রয়োজন। আবরণের কথা সেখানে মনেই আসেনা। কিন্তু এই গ্রীসীয় প্রস্তরমূর্তির পার্শে ফরাসী চিত্রশালার একখানি নগ্নদেহ চিত্র স্থাপিত কর, সে অকুণ্ঠিত সম্ভ্রম নাই, সে দীপ্তগৌরব নাই। ফরাসী চিত্রকর ঐ নারীমূর্তির সর্বাঙ্গ হইতে বসন স্খলিত করিয়া দিয়া পায়ে হয়ত জুতা রাখিয়াছেন, কিম্বা এমন করিয়া এমন কিছু রাখিয়াছেন, যাহাতে এই বর্তমান শতাব্দীর বসনভূষনের একটি ভাব মনে করাইয়া দেয় এবং এই বিবসনতার মধ্যে একটি সচেতন উদ্দেশ্য নিহিত করে।"—এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর কোন বিরোধ নেই: "যখন বহিঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তখন অন্তঃপ্রকৃতির সেই ছায়া সহিত চিত্রিত করাই কাব্যের উদ্দেশ্য। যখন অন্তঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তখন বহিঃপ্রকৃতির ছায়া সমেত বর্ণনা তাহার উদ্দেশ্য। যিনি ইহা পারেন, তিনিই সুকবি। ইহার ব্যতিক্রমে একদিকে ইন্দ্রিয়পরতা, অপরদিকে আধ্যাত্মিকতা দোষ জন্মে। এস্থলে শারীরিক ভোগ্য সক্তিকেই ইন্দ্রিয়পরতা বলিতেছি না, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে অনুরক্তিকে ইন্দ্রিপরতা বলিতেছি। ইন্দ্রিয়পরতা দোষের উদাহরণ জয়দেব। আধ্যাত্মিকতার উদাহরণ Wordsworth."(৫)

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস রচনাটি একটি তুলনামূলক আলোচনা। রচনাটির স্বাচ্ছন্দ্য আছে, কিন্তু কোন মৌলিক বক্তব্য নেই। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস আলোচনার প্রচলিত প্রথাবদ্ধতাকে তিনি

২। The Sublime : Oxford lectures on poetry – A.C. Bradley

৩। সশরীরে কোন নর গেছে সেইখানে,
মানস-সরসী-নীরে বিরহ-শয়ানে
রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশে,
জগতের নদীগিরি সকলের শেষে।" (মেঘদূত : মানসী)

৪। বিদ্যাপতি ও জয়দেব : বিবিধ প্রবন্ধ (প্রথম ভাগ)

ছাড়িয়ে উঠতে পারেন নি। এর দুবছর পরে লেখা রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাপতির রাধা প্রবন্ধটির(৫) সঙ্গে তুলনা করলেই বলেন্দ্রনাথের সীমা সম্পর্কে সচেতন হওয়া সম্ভব।

বাংলা সাহিত্য সম্পর্কিত অধিকাংশ সমালোচনাতেই বলেন্দ্রনাথ তেমন কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। এই শ্রেণীর সমালোচনা যেন বলেন্দ্রনাথের স্বক্ষেত্র নয়। কৃত্তিবাস, কাশীদাস, মুকুন্দরাম, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি কবিদের আলোচনা করেছেন, কিন্তু কোন মৌলিক চিন্তার পরিচয় দেন নি,— এমন কি বিষবৃক্ষের সূর্যমুখী কুন্দনন্দিনীর তুলনামূলক আলোচনাতেও এমন কিছু মনীষার পরিচয় দেন নি। এই জাতীয় আলোচনাগুলির অধিকাংশই সরস কাহিনী-বিবৃতি মাত্র,—আলোচনা অংশ অত্যন্ত দুর্ব্বল। অবশ্য একথাও সত্য যে বাংলা সাহিত্য সম্পর্কিত এই সমস্ত আলোচনায় বলেন্দ্রনাথের সম্মুখে তখনও বিশেষ কোন স্বীকৃত আদর্শ ছিল না। তাঁর সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনাগুলি পূর্ণতর। এই দুই আলোচনার গদ্যরীতিও স্বতন্ত্র। সংস্কৃত কাব্য সমালোচনায় যে গদ্যরীতি ব্যবহৃত হয়েছে তার ধ্বনিগৌরব, চিত্রধর্মিতা ও শব্দ-বিন্যাসের মধ্যেই পুরাতন পৃথিবীর আস্বাদন-বৈচিত্র্য বিদ্যমান; কিন্তু বাংলা সাহিত্য বিষয়ক সমালোচনার ভাষা ঘরোয়া ও আটপৌরে, মাঝে মাঝে বৈঠকী রসিকতার আমেজ মেশানো। বোধহয় সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে বলেন্দ্রনাথের একটি নিবিড় আত্মিক যোগও ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের চিত্রসমৃদ্ধ মেদ-মন্থর বিচিত্র কারুখচিত ভাষা একদা-জীবিত জীবনচর্যার চির-সহচর। সেদিন আর নেই, কিন্তু পুরাতন বাক্-বৈদগ্ধ অপ্সরীর স্খলিত বসনের মতো আজো দরিদ্র পৃথিবীর বুকে লুণ্ঠিত,—অতীতরূপমুগ্ধ রূপদক্ষ বলেন্দ্রনাথ তা-ই যেন সাগ্রহে কুড়িয়ে এনেছেন—তাই সে ভাষার গরিমার শেষ নেই। বলেন্দ্রনাথ সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা করতে গিয়ে যেন সেই জীবনেরই পৌরাধিকার লাভ করেন: "প্রেয়সীর মৃতদেহ কোলে করিয়া অজ যেখানে বিলাপ করিতেছেন—ইন্দুমতীর চারু বিলাসগমন, নূপুরনিক্কণ সহিত অশোকতরুতে মৃদু পাদতাড়ন, কোথায় অসমাপ্ত মালাগাঁথার কাহিনী, ললিত কলা বিদ্যায় তাঁহার নিপুণতার কথা, কোথাও বা রূপসীর রূপের অতি মৃদু আভাস; কোথাও একটি সুন্দর উপমা—এমন করিয়া বলা যায় যে শুনিলেই মনে একটি চিত্র ফুটিয়া উঠে; শ্লোকের শ্লোক কেবলই চিত্র বিন্যাস।"—কালিদাসের কাব্য-প্রসঙ্গে বলেন্দ্রনাথের ভাষাও যেন "অজ-বিলাপ"-এর আলস-মন্থর মাধুর্যে একটি চিত্রস্থির গরিমায় রূপান্তরিত হয়েছে। আবার অন্যদিকে সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনাগুলিতে উচ্চাঙ্গের মননশীলতাও বিদ্যমান।

সমালোচনার কতকগুলি সূত্র বা নীতি সম্পর্কেও বলেন্দ্রনাথ আলোচনা করেছেন। ইংরাজী বনাম বাঙলা, কবি ও সেন্টিমেন্ট্যাল, জীবন-ট্র্যাজেডি, স্বভাব ও সাহিত্য, স্মৃতি ও কবিতা প্রভৃতি রচনায় সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনা করেছেন। "ইংরাজী বনাম বাঙলা" প্রবন্ধটিতে বলেন্দ্রনাথ ইংরেজী ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার সম্পর্ক-সূত্রটি বিচার করে সুচিন্তিত মন্তব্য করেছেন, ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারই যে প্রাদেশিক সাহিত্যের সমুন্নতির কারণ, একথা তিনি স্পষ্টভাবেই বলেছেন। "কবি ও সেন্টিমেন্ট্যাল" প্রবন্ধটি স্বল্পবাক্, কিন্তু চিন্তা-প্রখরতায় দীপ্ত।—কাব্যবিচারে সেন্টিমেন্টালকে

৫। বিদ্যাপতির রাধা: আধুনিক সাহিত্য (১২৯৮)

অনেক সময় কবি বলে ভ্রম হয়। বলেন্দ্রনাথ বিদ্যুৎ-তীক্ষ্ণ ভাষায় যে স্বল্পাক্ষর মন্তব্যটি করেছেন তা অপূর্ব: "সত্যের সহিত সেন্টিমেন্ট্যালদিগের সম্বন্ধ অল্পই। কবি সত্য সত্য অনুভব করিয়া বলেন এইজন্য তাঁহার কথায় এত গুরুত্ব। সেন্টিমেন্টালদিগের ভাব অনুভবও অনেকটা কাল্পনিক। এইজন্য তাহা নির্জীব অনর্থপ্রসূ মাত্র। কল্পনা সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত না হইলে কবিতা হয় না। কল্পনাও যখন কাল্পনিক হইয়া দাঁড়ায়, তখন রোগের উৎপত্তি সন্দেহ নাই।"(৬) "স্মৃতি ও কবিতা" প্রবন্ধ কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কে একটি সংযত অথচ সারগর্ভ আলোচনা। বলেন্দ্রনাথ বলেন, "স্মৃতিতে প্রথম উচ্ছ্বাসের যখন পূর্ণ আবেগ, তখন নীরবতা বৈ তাহার ভাষা নাই। উচ্ছ্বাসকে আপনার অধীনে আনিতে পারিলে তখনই ভাষায় ব্যক্ত করা যায়।" প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কাব্যতত্ত্বের ব্যাখ্যায় এই মতের প্রচুর সমর্থন পাওয়া যায়। সমালোচক ম্যাথু আর্নল্ড সম্ভবতঃ বলেন্দ্রনাথ-কথিত স্মৃতি-সম্ভূত কাব্যকে "unconscious poetry" বলেছেন।(৭) "স্বভাব ও সাহিত্য" প্রবন্ধটির বক্তব্য সুস্পষ্ট নয়,—পরস্পর-বিরোধী মন্তব্যও আছে। একবার বলেছেন: "সাহিত্য স্বভাব ছাড়িয়া একপদ অগ্রসর হইতে পারে না।" আবার বলেছেন: "স্বভাবের সর্ব্বত্রই সাহিত্যের গতিবিধি।" প্রথম মন্তব্যটি বিতর্কমূলক—বর্তমানযুগে নানাকারণে এই মতটি অচল—প্রথম ও দ্বিতীয় বক্তব্যটি আপাত-বিরোধী।

৪

বলেন্দ্রনাথের রচনার বিষয়-বৈচিত্র্য কম নয়। তাঁর সমালোচনা শুধু সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যের সমালোচনার মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না, তিনি ললিতকলার সমালোচনাতেও সূক্ষ্ম রসবোধ ও নিপুণ পর্যবেক্ষণ-শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। রবিবর্মা, হিন্দুদেবদেবীর চিত্র, দিল্লীর চিত্রশালিকা, দেয়ালের ছবি, রঙ ও ভাব প্রভৃতি রচনাগুলি কলা-সমালোচকের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য বিচারের পরিচয়বাহী। "হিন্দু দেবদেবীর চিত্র" প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথ দেবদেবীর চিত্রে মানবীয় জীবন-ব্যঞ্জনার অনুসন্ধান করেছেন—সুগভীর মর্ত্যপ্রীতি ও জীবনপ্রীতির রসমুগ্ধ এই রূপতন্ময় সৌন্দর্য্যসাধক বলেছেন: "এই মৃত্যুই মর্ত্যের প্রধান সৌন্দর্য—পৃথিবীর সকল সুখদুঃখ বেদনা আনন্দের চরম পরিণাম। এই যে সকলি আছে অথচ হারাইবার ভয়, এই যে নশ্বরতা ইহাতেই ইহলোকের সকল সুখদুঃখ নিহিত। দেবলোকে যদি এই মৃত্যুই না রহিল, তবে দেবতাদের সুখদুঃখের সহিত আমাদের সুখদুঃখের সম্বন্ধ কিসের? ভারতবর্ষীয় হৃদয়, সুতরাং অমরধামেও মৃত্যুর ছায়া রচনা না করিয়া থাকিতে পারিল না। সতীর দেহত্যাগে ও রতিপতির অনঙ্গীকরণে এই মৃত্যুই অনুরূপ চিত্র সূচিত হইয়াছে।" "রঙ ও ভাব" রচনাটিতে

৬। "সৌন্দর্যসৃষ্টি করাও অসংযত কল্পনাবৃত্তির কর্ম নহে। সমস্ত ঘরে আগুন্ লাগাইয়া দিয়া কেহ সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালায় না। একটুতেই আগুন হাতের বাহির হইয়া যায় বলিয়াই ঘর আলো করিতে আগুনের উপরে দখল রাখা চাই।"—সৌন্দর্য্যবোধ: সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ।

৭। "Poetry attaches its emotion to the idea; the idea is the fact. The strongest part of our religion to-day is its unconscious poetry"—(The study of poetry.: Essays in criticism—Second Series)

অযথা কথা-বিস্তর নেই—বাক্-পরিমিতি ও বর্ণনা-সংযমে রচনাটি পরিচ্ছন্ন। বলেন্দ্রনাথ এখানে রঙ্গ ও ভাবের নিগূঢ়-সম্পর্কের কথা আলোচনা করেছেন। বলেন্দ্রনাথের কবিমন পঞ্চেন্দ্রিয়ের দীপ শিখায় রূপলক্ষ্মীকে আরতি করেছে সত্য, কিন্তু তাঁর বর্ণ-চেতনা ইন্দ্রিয়-সর্বস্ব নয়। শ্রেষ্ঠ চিত্রের বর্ণ বহিরাশ্রয়ী তুলির লিখনমাত্র নয়, সে রং একপ্রকার ভাবের রং—সেখানে শিল্পীর রং-ফলানোর জন্য কোন পৃথক প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না।(৮) বলেন্দ্রনাথের রীতি একটু স্বতন্ত্র,—তিনি ভাবকেই বর্ণ-নির্ভর মনে করেন, বর্ণকে ভাব-নির্ভর নয়। এখানে তিনি রং-কেই সত্য মনে করে সেই অনুযায়ী ভাবকে রূপান্তরিত করেছেন,—তবে বলেন্দ্রনাথের রঙেরও এক প্রকার ভাবচ্ছবি আছে—সেই ভাব-চ্ছবিটি যেন রঙেরই অশরীরী লাবণ্য।"(৯) এই প্রবন্ধটিতে প্রত্যেকটি রঙেরই ভাবরূপ উদ্‌ঘাটিত করেছেন বলেন্দ্রনাথ। "দেয়ালের ছবি" ও "দিল্লীর চিত্রশালিকা" প্রবন্ধ দুটির মধ্যে একটি যোগসূত্র আছে। "দেয়ালের ছবি" (১২৯৮) রচনাটির যেন পূর্ণরূপ সাত বছর পরে রচিত "দিল্লীর চিত্রশালিকা" (১৩০৫) প্রবন্ধটি। কিন্তু অতি-তরুণ বয়সেই কল্প-পৃথিবীর মায়াস্বপ্নের বিভোরতা এই তরুণ সৌন্দর্য্য-সাধকের চোখে রূপের কাজল পরিয়ে দিয়েছিল—স্বপ্নমুগ্ধ এই একুশবছরের তরুণ এই চিত্র-পৃথিবীর রূপের তীর্থে দুর্লভের সন্ধান করে ফিরেছেন : "এই ছবিগুলি দিয়া আমার মনের মধ্যে জগতের মায়াময়ী ছায়াপুরী রচনা করিয়াছি। বসিয়া বসিয়া দেখি, আর আমার মনের মধ্যে ইহারা জীবন্ত হইয়া উঠে, ছায়ার মত আসে যায়, বিচরণ করে। আমি ইহাদের সুখদুঃখ বেদনার মধ্যে আপনাকে বিস্মৃত হই।"

"দিল্লীর চিত্রশালিকা" বলেন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। বলেন্দ্রনাথের আভিজাত্যমণ্ডিত কারুখচিত গদ্যরীতির বাদশাহী-বিলাস অতীত পৃথিবীর ইন্দ্রজাল বর্ষণ করেছে। বলেন্দ্রনাথের মধ্যে এক অতীতচারী রোম্যান্টিক কবিমন ছিল,—ইন্দ্রিয়-সচেতন রূপানুভূতি ছিল। —প্রাচীন প্রাচ্য চিত্রকলার বর্ণনায় সেই দূরাভিসারী কবিমন এক লুপ্ত পৃথিবীর বর্ণগন্ধঘন স্বপ্ন ঘনিয়ে তুলেছে। বিস্মৃতির অবগুণ্ঠনের আড়ালে রূপময় ভারতবর্ষের কত ছবি। ছবির পর ছবি—আর চিত্রধর্মী পেলব-মসৃণ ভাষাতেই তার অনন্যসাধারণ ব্যাখ্যা ও কথাবিস্তার,—কথার রসে নূতন কথা ছবি হয়ে ভেসে উঠেছে। তার সঙ্গে অতীতের ঐশ্বর্যদীপ্ত বিলুপ্তনগরীর স্মৃতি-সৌরভ-ধূপের লঘুপক্ষ বিস্তার—বলেন্দ্রনাথ ছবির কথা বলতে গিয়ে ছবি এঁকেছেন—আর, লাক্ষারঞ্জিত ছাদের নীচে যে সোনারপ্রদীপ থেকে লঘুস্নিগ্ধ-গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল তারই চারপাশে স্বপ্নমুগ্ধ পতঙ্গের মতো ঘুরে বেড়িয়েছেন। —জনমানবহীন মহৎ রূপের কারাগারে রূপময় বলেন্দ্রনাথ চিরকালের জন্য যেন পথহারিয়েছেন : "লাক্ষাবিলেপ চিত্রিত সহস্রবর্ণের আভানিস্যন্দী ছাদহর্ম্যতলে দন্তিদণ্ডখচিত আস্তরণ-খোদিত চন্দনপাদপীঠোপরি জয়পুরী কারুকার্যময় সুবর্ণ দীপাধানে সুগন্ধী মেহাভিষিক্ত বক্তিকা শিখামুখ হইতে ধূপধূম্রগন্ধবৎ এক প্রকার লঘুস্নিগ্ধ সৌরভ উত্থিত হইয়া দিকে দিকে মৃদু অনুকূল মোহ

৮। কাশ্মরী চিত্র : প্রাচীন সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ।

৯। "কোন কিছুর হৃদ্‌গত ভাব বাইরের কতকগুলো ভঙ্গি দিয়ে ধরা পড়ে। রচনার ভঙ্গিতে কথার ভঙ্গিতে সুরের ভঙ্গিতে ওঠা বসা চলা ফেরার ভঙ্গিতে ধরা পড়লো ভাব, তবেই তো গেলেম মনের সঙ্গে মিলিয়ে বস্তুটির আসল রসটা।"
—ভাব : বাণীবরী শিল্প প্রবন্ধাবলী—অবনীন্দ্রনাথ

সঞ্চারিত করিতে থাকিবে" (১০)। রাজকীয় বর্ণনার উপযুক্ত এই কারুখচিত রাজকীয় গদ্য! দিল্লীর চিত্রশালিকা একটি অবলম্বন মাত্র, আসল উদ্দেশ্য ছবিগুলিকে অবলম্বন করে, রোম্যান্টিক বলেন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-সৌধে মানসিক অভিসার। বহুকাল পূর্ব্বের লুপ্ত জীবনচর্যার যে কয়েকটি স্থিরচিত্র চিত্রশালায় সংগৃহীত হয়েছে, তাকেই বলেন্দ্রনাথ বাসনার উত্তাপে বিগলিত করে জীবন-রস-সমৃদ্ধ করেছেন—তরুণ সৌন্দর্যসাধকের অন্তর্জীবনের লঘুস্পর্শ বর্ণমায়ায় তাই ঘুমন্ত সৌন্দর্যের যেন শতাব্দীর ঘুম ভেঙেছে। বলেন্দ্রনাথ চিত্র-আলোচনায় ভারতীয় শিল্পের গৌরবের কথা উল্লেখ করেছেন। অতীত ভারতের রূপময় আত্মা তাঁর রচনায় উদ্ভাসিত। অবনীন্দ্রনাথের জীবন-সাধনায় যে প্রয়াস ও সিদ্ধির কাহিনী, বলেন্দ্রনাথের এই জাতীয় রচনায় যেন তারই আভাস পাওয়া যায়। "রবিবর্ম্মা" সম্পর্কিত একাধিক রচনার মধ্যে সমকালীন শিল্পধারার মননশীল আলোচনা আছে। রবিবর্ম্মার চিত্রের দেশীয় ও ঘরোয়া আবেদন বলেন্দ্রনাথের সপ্রশংসদৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। একটি ঘরোয়া দৃষ্টি ও গৃহ-পরায়ণ কল্যাণ-সুন্দর দৃষ্টি বলেন্দ্রনাথের রচনার চিরসহচর হয়েছে। অপেক্ষাকৃত পরিণত রচনা-গুলির (১১) মধ্যে বলেন্দ্রনাথের এই কল্যাণ-পরিণাম সৌন্দর্য্যসৃষ্টির আদর্শ লক্ষ্য করা যায়।

বলেন্দ্রনাথের সমালোচনার মধ্যে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ও চিত্র-সমালোচনাই শ্রেষ্ঠ—বাংলা সাহিত্যের কোন আলোচনাতেই যেন তিনি সেই পর্যায়ের কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। এর যথার্থ কারণ কি? বলেন্দ্রনাথের কবিধর্মের সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্য ও চিত্রের একটি যোগ আছে। সংস্কৃত সাহিত্যের ধ্বনিগৌরব, বর্ণময় বর্ণনা ও চিত্রধর্মিতার কথা রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন,—চিত্রের সঙ্গে এর যোগাযোগ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। বলেন্দ্রনাথ সেই চিত্রবহ রীতির গদ্যলেখক। সুতরাং চিত্রধর্মী সংস্কৃত কাব্য ও চিত্র—এই দু'য়ের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র বহিরাশ্রয়ী নয়, আত্মিক। সেইকালের একটি বিমুগ্ধ শিল্পদৃষ্টি যেন এই অনভিজাত যুগে মাত্র কদিনের জন্য অভিশপ্ত হয়ে এসেছিল, কিন্তু তখনও সেই রসাবেশ যেন সম্পূর্ণ কাটে নি। বলেন্দ্রনাথের সমালোচনার ছত্রে ছত্রে তারই পরিচয়। বলেন্দ্রনাথ সমালোচকের কর্তব্য প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে গিয়ে যেন অজ্ঞাতসারে নিজের কথাই বলেছেনঃ "সকল সমালোচকের মধ্যে বিশ্লেষণ সাধারণ নিয়ম বলা যাইতে পারে। একজন সমালোচক পাঠককে খুঁটিনাটির মধ্যে আচ্ছন্ন না করিয়া, কিছু না বলিয়া কহিয়া অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে প্রকৃতির হৃদয়ের মধ্যে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দেন, পাঠক ভাব অনুভব করিয়া আকুল হইয়া উঠে।" (১২) বলেন্দ্রনাথের সমালোচনা সৃষ্টিমূলক। সাহিত্য ও শিল্প অবলম্বন করে বাসনালোকের স্বর্ণমেঘস্তর যেন নূতন মোহে আর একটি জগৎ সৃষ্টি করে। এইজন্য একজন আধুনিক সমালোচক বলেন্দ্রনাথের সমালোচনাকে "সমালোচনার শিল্প" বলেছেন (১৩)। বলেন্দ্রনাথের সমালোচনা বিশ্লেষণ-ধর্মী। তাই সমস্তখণ্ডকে এক করে সৌন্দর্য-নির্যাস ও সুকুমার রসবোধ সেখানে বড় হয়ে উঠেছে।

বিশ্লেষণী সমালোচনা মূলতঃ বুদ্ধি-নির্ভর; কিন্তু সৃষ্টিমূলক সমালোচক এক ধরণের স্রষ্টা।

১০। ক্ষুদিতপাষাণ (গল্পগুচ্ছ—২য় খণ্ড)-এর গদ্যরীতি দ্রষ্টব্য।

১১। "শ্রীহর্ষ," "শুভদৃষ্টি," "লক্ষ্মীর," "কল্যাণীমূর্তি"—প্রভৃতি রচনাগুলি দ্রষ্টব্য।

১২। স্বভাব ও সাহিত্য : ভারতী ও বালক, অগ্রহায়ণ, ১২৯৬।

১৩। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর : বাংলার লেখক—প্রমথনাথ বিশী।

"দুমন্ত" "যশোদা" প্রভৃতি চরিত্র-চিত্র একপ্রকার নবসৃষ্টি। সাহিত্য ও চিত্রের এক প্রকার আস্বাদন রস আছে—সেই রস পাঠকচিত্তের বাসনালোকে যে মৃদু স্পন্দন জাগায়—তারই ফলে একটি নূতন রূপলোক ফুটে ওঠে; বলেন্দ্রনাথের সমালোচনা তাই। এইজন্য তাঁর শ্রেষ্ঠ সমালোচনায় সচেতন জাগ্রত-বুদ্ধি অনুপস্থিত; বর্ণগন্ধশব্দ-মধুর কল্পজগতের সুখাবেশ-ময় আবিষ্ট অনুভবই তাঁর অধিকাংশ সমালোচনার নিয়ন্ত্রী। সমালোচক বলেন্দ্রনাথের সঙ্গে সৌন্দর্যসাধক বলেন্দ্রনাথের যোগাযোগ অবিচ্ছেদ্য। কারণ বলেন্দ্রনাথ প্রধানতঃ নন্দন-বিলাসী লেখক—বোধহয় সিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এইখানেই তাঁর প্রতিভার সবচেয়ে বড় সীমা। রবীন্দ্রনাথও এক সময় এই বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যের মায়ায় মুগ্ধ হয়েছিলেন—"কড়ি ও কোমল" থেকে "চিত্রা" পর্যন্ত কাব্যসাহিত্যের মূলসুর ইন্দ্রিয়-সচেতন সুখচারী বিশুদ্ধ ও পরিশ্রুত সৌন্দর্যের নন্দন-মায়াস্বপ্ন; কিন্তু পরিণত-মানসে এই সৌন্দর্যের বাসর তাঁকে আবদ্ধ করে রাখতে পারেন নি—নূতন সত্যের দিগন্ত অনুসন্ধান করতে হয়েছে—তাই বার বার কবিকণ্ঠে দ্বিধার আর্তনাদ। এই হিসেবে বলেন্দ্রনাথ সৌন্দর্য-সাধক হয়েও পূর্ণ নন। বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুকালে কোন কোন লেখক তাঁকে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড় গদ্যশিল্পী মনে করেছিলেন (১৪)—এই মত সমকালীন সমালোচকের আতিশয্য-রঞ্জিত উচ্ছ্বাস মাত্র। কারণ বলেন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধ মোহগ্রস্ত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যচেতনায় মোহ থাকলেও তিনি অনায়াসে মোহোত্তীর্ণও হয়েছেন। কীট্‌সের সৌন্দর্যসম্ভোগ যত বড় হোক, শেক্সপীয়ারের অনাসক্ত সত্যদৃষ্টি থেকে বহুদূরে—শেক্সপীয়রের তুলনায় এই বোধ পুরাতন জগতাশ্রয়ী একটি খণ্ড পৃথিবীর দ্বৈপায়ন-স্বপ্নচারণা মাত্র। বলেন্দ্রনাথের জগৎ "ইস্‌থেটিক্‌সের" জগৎ,—সুন্দর হলেও মহৎ নয়, তিনি "good artist," কিন্তু "great artist" নন—এইখানেই তাঁর প্রতিভার নির্ধারিত সীমা।

১৪। "বসুমতীর যে লেখক যে বলিয়াছেন, "বলেন্দ্র সুলেখক···কেমন শব্দ-লালিত্য, ভাবমাধুর্য অলঙ্কারের সামঞ্জস্য অনেক সময়ে পুরাতাত শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও দেখাইতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ"—ইহা নিতান্ত অত্যুক্তি নয়।"—ফণীন্দ্র বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর : প্রিয়নাথ সেন।

হিরোইন

প্রকাশ পাল

সখের থিয়েটারের হিরোইন-খোঁজা ভদ্রলোকটি আর একটি নতুন মেয়েকে নিয়ে এসে বললেন, 'দেখুন শ্যামলবাবু এঁকে দিয়ে চলবে কিনা—'

অপাঙ্গে তাকিয়ে দেখলুম। এমনিই নিয়ম। কারণ নাটকটির সুদক্ষ পরিচালনার ভার আমার ওপরে। নাটকটির সুন্দর রচনা সেও আমার—নাটকের নায়ক সেও আমি। 'এহ বাহ্য'। সংঘ-সদস্যরা অনুগ্রহ করে নাটকটি মঞ্চস্থ করার খরচের ভারটুকুও আমারই স্কন্ধে অর্পণ করেছেন। অতএব এ ব্যাপারে কারও দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে না চাইবার অধিকার আমার জন্মেছে।

পরিচয় হল। হেসে নাম বললেন ভাবী হিরোইন, 'বাসনা মল্লিক।'

উৎসাহিত বোধ করলুম না খুব। উনিশ থেকে একুশের মধ্যেই হবে বয়সটা। অত্যন্ত সাধারণ চেহারা। রোগাটে গড়ন। পরনের সাড়ীটা সাদামাটা। গায়ের রং কালো ঘেঁসা শ্যাম। মুখের গড়নটা অবশ্য ওরই মধ্যে ভালো। চোখদুটো মাঝারি, একটু জলজলে। কিন্তু সমস্ত অবয়বের মধ্যে যেটা সবচেয়ে ভালো সেটা ওর পাতলা দুখানি ঠোঁট। দেখলেই মনে হয় হাসছে। আর হাসেও।

মেয়েটি অবশ্য ব্যতিক্রম। কারণ এর আগে যারা এসেছিল তাদের প্রত্যেকের মুখেই ছিল ঘন রংএর পোঁচ। পরনে বিরল পাড় সিল্কের বা ওই ধরণের দামী কিছু একটা সাড়ী। ঠোঁটে পুরু লিপষ্টিক আর অনেকের চোখেই অমাবস্যার রাতেও ছিল 'সান্‌গ্লাস'। হাতে রংবেরংএর ভ্যানিটি ব্যাগ। তাই বাসনা মল্লিকের এই নিতান্ত গন্ধময় পাউডারটুকুও না-বোলানো মুখ আমার মনে কোন প্রেরণাই দেয় না ওকে আমার কল্পনার রাণী, রূপ ও গুণে রমণীশ্রেষ্ঠা হিরোইনের ভূমিকায় নামাতে।

নিতান্ত অবহেলার সঙ্গেই সিগারেটের ছাইটা ঝাড়তে ঝাড়তে তবু ভদ্রতার খাতিরে জিজ্ঞাসা করলুম, 'অভিনয় করেছেন আগে? কি কি রোলে?

'অনেক রোলে। কত বলব?'

কথা বললে মনে হয় মেয়েটি যেন আরও হাসে।

আমি আরো বেশী গম্ভীর হয়ে বললুম 'একটু ট্রায়াল দিতে আপত্তি হবে না তো?'

'না, না, আপত্তি কিসের?'

একটুখানি বলানো হয় ওকে। নায়ক নায়িকার প্রণয়দৃশ্যের একটু টুকরো।

ভালো লাগে না। ভালো না উচ্চারণভংগী। প্রকাশভংগীতেও অনেক কৃত্রিমতা। নায়িকাকে কেমন যেন বেশী গায়েপড়া প্রেমিকা বলে মনে হয় ওর বলার ধরণে। আমার নায়িকা সে হবে চটুল অথচ দৃঢ়। প্রণয়াকাঙ্খিনী কিন্তু ছাকামিকে সে ঘৃণা করে।

হিরোইন-খোঁজা লোকটি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি রকম? চলবে—?'

স্পষ্টই না বলতে যাচ্ছিলুম। হঠাৎ চোখ পড়ল বাসনা মল্লিকের মুখে। জলজলে দুটি চোখে একাগ্রদৃষ্টিতে ও চেয়ে আছে আমারই দিকে। না-টা বেধে গেল মুখে। কনে-দেখা গোছের বললুম 'ঠিক বোঝা যাচ্ছে না এখনো। ম্যানস্‌ক্রিপ্ট বই। বইটা জানার সুযোগ দিতে হবে। আরো বলাতে হবে।'

আমার কথা শেষ না হতেই তাড়াতাড়ি বলে উঠল বাসনা মল্লিক, 'নিশ্চয়। কিছু জানি না বলে প্রথম প্রথম বড় অসুবিধে হচ্ছে।'

কথা শুনে আমার হাসি পেল। হাজারদিন হাজারবার বললেও তোমার দ্বারা নায়িকা হওয়া অসম্ভব। তোমার গুণ ধরা পড়েছে। হাঁড়ির একটা চাল টিপেই বোঝা যায় ভাতটা কেমন হল। মুখে বললুম, 'রিহার্সাল পরের শনিবার। আসবেন—'

সবে ঘুম থেকে উঠে চা খেতে বসতে যাচ্ছি। মা বললেন, 'শ্যামু, বাইরে কে ডাকছে তোকে, একটি মেয়ে—'

মেয়ে? এত সকালে? কে মেয়ে? তাড়াতাড়ি বাইরে এলুম।

'আপনি?' অবাক লাগল আমার।

'হ্যাঁ আমিই। খুব অবাক হয়েছেন না?' হেসে বলল বাসনা।

সকালের মিষ্টি আলোয় হাসিটা ভালই দেখালো।

আমি বললুম, 'তা অবাক একটু হয়েছি। টালিগঞ্জ থেকে এত দূরে এই সকালে?'

'না টালিগঞ্জ থেকে নয়। আমার এক আত্মীয়ের বাড়ী এখানে, এসেছিলাম কাল রাতে। আজ যাচ্ছি ফিরে। ভাবলুম যাই একবার আপনার সঙ্গে দেখা করে।'

'ওঃ, তা আমার ঠিকানা পেলেন কোথা?'

'কেন বিধানবাবুর কাছে—'

সেই হিরোইন-খোঁজা ভদ্রলোকটি।

'কিছু দরকার আছে কি?' গম্ভীর হয়েই জিজ্ঞাসা করলুম।

একটু যেন কুণ্ঠিত মনে হল বাসনা মল্লিককে।

বললুম, 'একটু দাঁড়ান, আসছি—'

বাড়ীর ভেতর থেকে জামাটা পরে এসে বললুম, 'চলুন, ওই দোকানটায় একটু চা খাওয়া যাক।'

এসব মেয়েকে বাড়ীতে নিয়ে যেতে কেমন যেন সংকোচ জাগে। একদিন একটু মাত্র মৌখিক পরিচয়ে যে এত ভোরে টালিগঞ্জ থেকে বরানগর ছুটে আসতে পারে এমন প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন মেয়েকে অন্দরের পথ না দেখানোই ভাল। হয়ত বানের জল ঘরে ঢুকে ঘরের জলকেও পথে নামাবে। কাজ নেই তাতে।

দোকানে চা খেতে খেতে ওকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'এবার বলুনতো কি এমন দরকার?'

'আমাকে কি নেবেন আপনাদের অভিনয়ে?'

'সেতো সেদিন বলেছি। আরও ট্রায়াল দিয়ে তবে।'

'ও।' চুপ করে চায়ের কাপে চুমুক দিতে থাকল বাসনা মল্লিক।

এবার আমি বললুম, 'এই কথা বলতে—'

ও বলল, 'না, মানে—রোলটা যদি দেওয়া ঠিক হয় ভেবেছিলুম এ্যাড্‌ভান্স চাইব। তা ঠিকই যখন হয়নি—' একটু হেসে আবার বলল 'কিছু মনে করবেন না, আত্মীয়-বাড়ী থেকে ফেরার পথে টাকার একটা বিশেষ দরকারের কথা মনে পড়লো তাই—'

তাই একটা ঢুঁ মেরে গেলেন। বাসনা মল্লিক, পেশাদার না হলেও অভিনয় আমি বড় কমদিন করছি না। আমাকে বাগে আনা এত সোজা? বাপ-পিতামহর কিছু আছে বলেই-যে যথেচ্ছ বদান্যতা যেখানে সেখানে দেখাবো এটা তুমি ভাবলে কি করে? মুখে বললুম, 'না, না এতে মনে করার কি আছে?'

শনিবার। রিহার্সাল-রুমের বাইরে বারান্দার এককোণে নিরালায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাচ্ছি, কে যেন দাঁড়াল গা ঘেঁসে। ফিরে দেখি বাসনা মল্লিক। একটু সরে দাঁড়ালুম।

'চলে এলেন যে?' ও জিজ্ঞাসা করল।

মুখের হাসিটা দেখা যাচ্ছে। সামনের বাড়ীর ছাদের ওপর রাখা নিওন লাইটের বিজ্ঞাপনের লাল আলোটা ওর মুখের ওপর এসে পড়েছে।

বললুম, 'বকে বকে হাঁপিয়ে উঠেছি। একটু রেষ্ট নিচ্ছি।'

আরও একটু গা ঘেঁসে এসে আব্দারের সুরেই ও যেন বলল, 'আহা তা আর হবে না। আমাদের মত গবেট নিয়ে—

বাধা দিতে হল। হেসে বললুম, 'নিজেকে অত খারাপ ভাবছেন কেন—?'

ইতিমধ্যে আরও সরে যেতে হয়। কিন্তু উপায় নেই। ওদিকে দেওয়ালে আটকাচ্ছে। অথচ বাসনা মল্লিক একেবারে গায়ের ওপর এসে দাঁড়িয়েছে। ওর দেহের উষ্ণতা আমি পাচ্ছি। পরিস্থিতিটা বিশ্রী হবে কেউ দেখলে। বললুম, 'চলুন, রিহার্সালটা দিয়ে নিই—'

বলেই ঘরের দিকে এগোই। বাসনা পেছনে আসে। ঘরে এসে ওকে পার্ট বলতে বলি। ও সুরু করে।

কিন্তু না:, হবেনা। কিছুতেই বাসনাকে দিয়ে নায়িকা করানো যাবেনা। আজকে যেন নির্লজ্জ জাকামী সুরু করল পার্ট বলতে গিয়ে। যেমনি বলার ধরণ তেমনি অংগভংগী! হচ্ছে না বলাতে হাসতে লাগল। যেন মস্ত ছেলেখেলা করতে বসেছি আমরা। আর বাসনা মল্লিক ওর হাসি দিয়ে যেন আমাদের মুগ্ধ করে দিয়েছে! বাধ্য হয়ে বলতে হল, 'মাফ করবেন, আপনাকে নিতে পারলুম না আমরা—'

মুখের হাসিটা যেন সেই মুহূর্তেই থেমে গেল বাসনার। দু এক সেকেণ্ডের জন্য আমার দিকে

চাইল পূর্ণ-দৃষ্টিতে। একটু বোধহয় পাণ্ডুর দেখালো মুখটা। কিন্তু সে হয়ত আমার দৃষ্টিভ্রম। পরক্ষণেই হেসে বলল, 'হবে না জানতুম! যা খটমটে ভাষা আপনার নায়িকার। তারপর বলল, 'দয়া করে আমায় একটু পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করবেন শ্যামলবাবু?'

আমি বললুম, 'বিধানবাবু কই?'

'তিনি তো চলে গেছেন—'

'তবে, গাড়ীতে তুলে দিলে একা যেতে পারবেন না?'

'ভয় করে। রাত হয়ে গেছে। পাড়াটা বিশ্রী। একা মেয়েছেলে।'

বিপদে পড়লুম। যারা এসব পছন্দ করে তাদের একজনও হাতের কাছে নেই। বললুম, 'চলুন, আমিই যাই—'

'আপনাকেই যেতে হবে শেষ পর্যন্ত! কি মুস্কিল!' বলেই হো হো করে হেসে উঠল বাসনা মল্লিক।

বাসে উঠতে গিয়ে হঠাৎ মনে হল এককাপ চা হলে মন্দ হত না। প্রস্তাব করলুম। বাসনা বলল, 'মন্দ কি? হয়ত আর দেখা হবে না কখনও তবু আপ্যায়নটা মনে থাকবে—'

রেস্তোঁরার নির্জন কেবিনে মুখোমুখি বসলুম দুজনে। মুখ নীচু করে আছি দুজনেই। চুপচাপ। কিই বা কথা হবে। কতটুকু জানি দুজনকে দুজনে যে কথা বলব। তবু যেন অবস্থাটা অস্বস্তিকর লাগলো। চা এল। চুমুক দিলুম কাপে। হঠাৎ বাসনা বলল, 'শ্যামলবাবু, আপনার কি মনে হয় অভিনয় করার কোন যোগ্যতাই আমার নেই।'

বললুম 'তা কেন, না, না—'

'কি আমার অভাব? বলতে পারি না পার্ট? আমায় দেখতে কি খুবই কুৎসিত?'

অস্বস্তিকর প্রশ্ন। মাথা বোধহয় আরও নেমে গেল চায়ের কাপের ওপর।

ও বলতে লাগল, 'অবশ্য মনে হয় তাই। সেজন্যেই আপনি নিলেন না—আগাগোড়াই দেখলুম আপনি আমায় ভাল করে চেয়েও দেখলেন না। এখনও আপনি অন্য দিকেই চেয়ে আছেন—কেন, আমি কি এতই—'

কথা শেষ করল না।

হেসে ওর দিকে চাইতে গেলুম আমি। কিন্তু চাবুক খেলুম যেন মুখের ওপর। সত্যিই এতক্ষণ ভাল করে লক্ষ্য করিনি এত পাতলা ছিটের এতটা লোকাট একটা জামা আজ ও পরে এসেছে। হয়ত আঁচলটা দেহে জড়ানো ছিল বলেই। কিন্তু উত্তেজনার ফলেই হয়ত সেটা যথাস্থান থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

ঘরের অন্ধকার দাওয়ার ওপর পা রেখে চীৎকার করে উঠল বাসনা মল্লিক। 'কে কে ওখানে—'

প্রথমটা কোন জবাব আসে না। বাসনা আবার চীৎকার করল, 'কে? সাড়া দাও বলছি—'

একটা ভয়ার্ত কিশোরী কণ্ঠে উত্তর এল, 'আমি।'

'আর কে—?'

সেই সঙ্গেই একটি ছোকরা সেই অন্ধকার কোণ থেকে উঠে এসে আমাদের ধাক্কা দিয়েই বেরিয়ে গেল সদর দরজা দিয়ে।

বাসনা মল্লিক বাঘিনীর মত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ঝাঁপিয়ে গিয়ে চুলের মুঠি ধরল কিশোরীর।

'কে, কে ছিল তোর সঙ্গে? বল্, বল্ মুখপুড়ী—'

'বোঁচা, বিড়ির দোকানের বোঁচা।'

আর কথা বলার সুযোগ হয় না তার। তার সারা দেহের ওপর পড়তে লাগলো বাসনা মল্লিকের উন্মত্ত হাতের কিল, চড়, ঘুসি।

কিশোরী বালিকা তারস্বরে আর্তনাদ করতে সুরু করল।

'মেরে ফ্যাল্ মেরে ফ্যাল্ মেয়েটাকে। গলাটা টিপে ধর তার চেয়ে—একেবারে শেষ হয়ে যাক।' বলতে বলতে সামনের বন্ধ দরজা খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন এক বৃদ্ধা। কম পাওয়ারের আলোতে তাঁর চেহারাটা প্রেতিনীর মত দেখাতে লাগলো।

গলা আরো চড়ে গেল বাসনা মল্লিকের, 'তুমি তো তোমার আদুরে মেয়েকে মেরে ফেলতেই দেখ আমায়। জানো ও আজ বিড়িওলা বোঁচার—'

কথা শেষ না হতেই আবার মার সুরু হল।

হাঁপাতে হাঁপাতে বৃদ্ধা বললেন, 'কি করবে? কে দেখবে ওকে? সারাটা দিন তুমি কি বাড়ীর ত্রিসীমানায় থাকো? সেই সকালে যাও, রাতে আসো শুতে।'

বাসনার মার থামল। চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'কোন্ লজ্জায় একথা তুমি বল মা? কি করে দেখব আমি? সখ করে বেড়াই যদি বাইরে বাইরে কি করে চলে এ সংসার, কে জোগায় সব খরচ? এর জন্য কত হীনতা যে আমায় সহ্য করতে হয়, তা যদি জানতে—'

কান্নায় বুজে এলো বাসনার গলা।

'কোরো না, কিচ্ছু কোরো না। যদি কর তোমার মরা বাপের দিব্যি রইল।'

উত্তেজনায় চেঁচিয়ে কথা বলতে গিয়ে প্রবল ভাবে কাশতে লাগলেন বাসনার মা। অবশেষে বমি। রক্তবমি।

বাসনা কান্না ভুলে গেল। তাড়াতাড়ি ধরল গিয়ে মাকে। ডাকতে লাগল, 'মা, মা—'

রক্তবমিতে ভিজে গেল ওর কাপড় চোপড়।

'ললিতা, শীগগির পাখা আন্। বাতাস কর্ মাকে।'

এতক্ষণের মারের জ্বালাও ললিতার মনে রইল না। পাখা এনে বাতাস করতে লাগল মাকে।

আমি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছি স্থাণুর মত। বিস্ময়ের প্রচণ্ডতা আমার সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রীকে অচল করে দিয়েচে বোধহয়।

একসময় শুনলুম বাসনার গলা, 'শ্যামলবাবু, আমার মাকে একটু ধরবেন। ঘরে শুইয়ে দোব। অবশ্য যক্ষ্মারোগীকে ছুঁতে যদি আপত্তি না থাকে তো—'

আমি বললুম, 'মিস্ মল্লিক, এতখানি অভদ্র আমি নই।'

অবশেষে বাসনা বলল, 'মা একটু ভালই আছেন মনে হচ্ছে। বড় বিরক্ত করলুম। হয়ত বাস পাবেন না। চলুন গলিটায় আলো দেখাই।'

একটা আলো এনে হেসে বলল, 'আমার মত একটা মেয়ের জন্যে কতগুলো টাকা হয়ত ট্যাক্সি-ভাড়া চলে যাবে অযথা। যাক, তবু মনে থাকবে—'

মুখের দিকে চাইলুম ওর। হাসিটা তীব্র নয়, ক্ষীণ।

গলির মুখে এসে বাসনা বলল, 'চলি শ্যামলবাবু—'

আমার তখন কি মনে হলো, বললুম, 'দাঁড়ান—'

বাসনা পেছন ফিরেছিলো, ও ঘুরে দাঁড়ালো।

'আপনি কালকে থেকে রিহার্সালে যাবেন।' আমি বললুম, 'আপনাকে হিরোইনের রোল দেওয়া হবে।'

বাসনা চমকে উঠলো।

বললুম, 'ও নাটক হবে না। আমি নতুন নাটক লিখব।'

উড়ো মেঘ

অনিলকুমার দলুই

ছাড়—

কাকগুলো এখনো ডাক সুরু করেনি।

কানে তুলো দিলে ডাক কানে আসবে কি?

এলেই তো বিপদ।

বিজয় সুপ্রিয়াকে আশ্লেষাবদ্ধ করে। সুপ্রিয়া বিজয়ের হাত দুটো সরিয়ে সরে যায় একটু ছেলেটার দিকে। ঘুম-ভাঙা চোখ দুটো বড়ো বড়ো করে বলে: হ্যাংলামো গেলোনা এখনো?

সবে তো সুরু, এরই মধ্যে সারার কথা কেন?

সুপ্রিয়া মশারির বাইরে এসে বলে: কাজ-টাজ একটা দেখো। এমন কোরে থাকতে তোমার ভালো লাগে?

মন্দ তো লাগে না। তবে তুমি বাপের বাড়ী গেলে ঘন ঘন বাস-ট্রাম ফেয়ার যোগাতে বেজায় খারাপ লাগে!

তোমার সবেতেই রসিকতা?

রসিকতার দাম কতো জানো? এই রসের ভেয়ান চড়িয়েই গোপাল ভাঁড় অমর হয়ে গেল।

সুপ্রিয়া এবার রেগে যায়। বলে: তোমার গায়ের চামড়া নেই?

অত্যন্ত সহজ স্বরে বলে বিজয়: না থাকলে তোমার দেহের সুখ-স্পর্শ পাই কি করে?

তুমি একটা কি?

অত্যন্ত সাধারণ শান্তিকামী একটি মানুষ।

থাক তোমার শান্তি নিয়ে।

খিলটা একটু জোর কোরে খুলেই বেরিয়ে যায় সুপ্রিয়া। বিজয়ের ওপর তার মাঝে মাঝে এতো রাগ ধরে যে, বলবার কথা নয়। বাড়ীর বড়ো ছেলে, বিয়ে করেছে, ছেলের বাপ অথচ বেকার।

বিনোদবাবু তখন কাজ করতেন, অপর্ণা দেবী সাধ করে ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন। সায় ছিলো শ্বশুর-শাশুড়ীর কারণ বিনোদবাবু রিটায়ার করবার পর ছেলেকে নিজের আফিসে ঢুকিয়ে দিতে পারবেন এ ভরসা তাঁর ছিলো। কিন্তু চাকা ঘুরে গেল। বিনোদবাবু রিটায়ার করলেন। কিন্তু কাজ হলো না বিজয়ের। অফিসের সাহেব বদলে যেয়ে বিপত্তি হল। বিজয় চেষ্টা করেছে, করছে, কিন্তু কাজ মেলা ভার। বিজয়ের মেজ ভাই অজয় যা কাজ করে। শ' দেড়েক টাকা মাইনে পায়।

অথচ বাড়ীতে পোষ্যের অভাব নেই। বিজয়রাই সাত ভাই-বোন। অজয়ের পরে সঞ্জয়। সে কলেজে পড়ে; অবশ্য তার খরচা সে-ই যোগায় ট্যুশনি কোরে। দুটো বোন ইস্কুলে পড়ে। অপর্ণা দেবী মাঝে মাঝে বলেন : বৌমা, সংসার-সংসার কোরে জীবনে একদিনও সুখ পেলুম না।

সুপ্রিয়া উনুনে আঁচ দিয়ে চানটা সেরে নেয়। অজয় বেরোয় নটায়। রিতা-মিতার ইস্কুল সাড়ে দশটায়। সকাল-সকাল আঁচ না দিলে অজয়ের ভাত ঠিক সময় মত হয়ে ওঠে না। ও আবার বেজায় বদ্‌মেজাজী; টাইম মত খাবার না পেলে না-খেয়েই চলে যাবে আর সারাদিন সকলের কাছ থেকে কথা শুনতে শুনতে তার জীবন যাবে।

চা করে বিনোদবাবুকে দিয়ে আসে। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে তিনি বলেন : বৌমা, ক'ঘণ্টা ঘুমোও বলোত ?

মাথা নীচু করে সুপ্রিয়া বলে : অনেকক্ষণ তো !

শোও তো রাত বারোটায়, আর ছ-টায় চা পাই। এতেই বোঝা যায়, তুমি ঘুমোও কতোক্ষণ। মাঝে মাঝে মা, একটু বিশ্রাম নেবে, না হোলে শরীর একেবারে ভেঙে পড়বে। আচ্ছা, মেয়ে দুটো উঠেছে ?

চুপ কোরে থাকে সুপ্রিয়া।

ওঠেনি ? ওদের হাড়ে দুব্বো গজাবে ! আচ্ছা, বৌমা, তুমি ওদের ডেকে দিতে পারনা ?

ওরা ছোট···

ছোট ! ওদের বিয়ে দেবার বয়েস হয়েছে। ···যাক্, সব বাজে চিন্তা, যত ভাবি ভাববো না তত ভাবনাগুলো সব পেয়ে বসে। আর তোমার দিকে তাকালে···

থামিয়ে দেয় সুপ্রিয়া : বোধহয় আপনার কাগজ এসেছে···

এসেছে ?

বোধহয়।

পাঠিয়ে দিও।

সিঁড়িতে সঞ্জয় ধরে : বৌদি, খোকন উঠেছে ?

কেন ?

কাল ওর চমৎকার একটা জামা এনেছি।

তুমি কেন আন্‌তে গেলে, সেজ ঠাকুরপো ?

কেন ও কি আমার ভাইপো নয় ? মেজ কর্তার মত উপায় না করতে পারি, তা বলে আমাদের সখ বলে কিছু নেই ?

এক গাল হেসে সুপ্রিয়া বলে : নিশ্চয় থাকবে। ···কৈ দেখি কি এনেছ ? ···বা: বেশ তো। তোমার পছন্দ ভাল।

মানাবেনা খোকাকে ? —জল হয়ে যায় সঞ্জয়।

খুব সুন্দর ! ···পড়াতে যাচ্ছ ?

হ্যাঁ।

চা খাবে ?

ওদের বাড়ীতেই খাবো।

শেষে আসে বিজয়ের কাছে। সে সদ্য-আসা খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে। সুপ্রিয়াকে দেখে বলে : শেষে অধমের কাছে ? তারপর জোর করে বলে :

দাও পিয়ালা প্রিয়া আমার
অধর পটে পূর্ণ করে।
যাক্ অতীতের অনুতাপ আর
ভবিষ্যতের ভাবনা মরে ॥

ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছ কেন ? না যে সামনে বসে রয়েছেন। লজ্জা করে না ?

লজ্জা ! ওটা তোমাদের আবরণ ও আভরণ, থৈয়াম লজ্জা মানে না।

থৈয়াম আওড়ালে ভাত মিলবে ?

তুমি তো থাকবে, তাহলে-ই থৈয়াম আমার খিদে মেটাবে।

ডাক আসে : বৌমা, কাগজটা···

যাই, বাবা···

রান্নাঘর থেকে বেলা দুটোয় বেরোয় সুপ্রিয়া। কোমরের কাপড়টা খুলে মুখটা মোছে। একটানা সাত ঘণ্টা আগুনের তাপে তার মুখটা একেবারে সেকে যায়। একটা কালচে দাগ পড়ে যায় সারা মুখের ওপর।

অপর্ণা দেবী ভাত নিয়ে বসে থাকেন। সুপ্রিয়া না এলে তাঁর খেয়ে যেন পেট ভরে না। খেতে খেতে নানা গল্প করেন। দুবেলা খাবার সময় বসে বসে গল্প কোরে কোরে খাবার শেষ করেন; আর বুঝিবা জিরোবার কাজটাও সেরে নেন। ডাকেন : বৌমা।

বাইরে থেকে সুপ্রিয়া বলে : যাই, মা।

তাড়াতাড়ি এসো, বেলা দুটো বেজে গেছে।

সুপ্রিয়া এসে বসে অপর্ণা দেবীর পাশে। ভাতের গ্রাস মুখে তুলে তিনি বলেন : তোমায় এবারে দিন কতকের জন্যে মাণিকতলায় পাঠিয়ে দোব। শরীরটা তোমার বড্ড খারাপ হয়ে গেছে।

মাণিকতলায় সুপ্রিয়ার বাপের বাড়ী।

সুপ্রিয়া আপত্তি করে : এই তো সেদিন এলাম।

তোমরা বাপের বাড়ী যেতে চাওনা কেন বুঝি না। আমরা বাপের বাড়ী যাবার নাম শুনলে ঠায় রাস্তার দিকে জানলায় দাঁড়িয়ে থাকতুম। তোমাদের আবার বাপের বাড়ী যাবার নামে অরুচি !

সুপ্রিয়া মাথা হেঁট করে। চাপা লজ্জায় পাতলা চামড়ার নিচে রক্তের লালাভা ফুটে ওঠে। একটু পরে মৃদু হেসে বলে : আমি গেলে আপনার যে বড় কষ্ট হবে।

কষ্ট হবে বলে বৌকে বাপের বাড়ী পাঠাব না? এই যে তুমি এতোদিন ছিলে না, তা বলে কি বাড়ীর কাজ বন্ধ ছিল?

তা কেন থাকবে!

তবে?

যখন ছিলাম না তার খবর রাখি না কিন্তু যখন এসেছি তখন সব দিক দেখে চলতে হবে তো।

অপর্ণা দেবী সুপ্রিয়ার মুখের দিকে তাকালেন। বড়ো ভাল মেয়ে। সারাদিন চরকির মত ঘোরে কিন্তু ঠোঁটের কোণে হাসি মিলিয়ে যায় না। কি এক অসীম মমতায় তাঁর হৃদয় কানায় কানায় ভরে ওঠে।

মাঝে মাঝে তাঁর মনে হয়, একটা ঝি রেখে ওর কাজ কিছুটা কমিয়ে দেন। সংসারের অবস্থার দিকে চেয়ে মনের ব্যথা মনেই পুষে রাখতে হয়। তাঁর হাত-পা বাঁধা, করব বললেই করা যায় না। বিজয়টা যদি একটা কাজ-কর্ম করত…।

আচ্ছা বৌমা, বিজয় কোন কিছু চেষ্টা করছে?

বলে তো।

ফ্যাকাসে হয়ে আসে সুপ্রিয়া। বিজয়-প্রসংগ উঠলেই তার রক্ত-শূন্যতা প্রকট হয়ে ওঠে। অসীম লজ্জা-দ্বিধা-রাগ সব এক সাথে তাকে চারপাশ থেকে অদৃশ্য হাত মেলে টিপে ধরে। অপরাধ যেন তার-ই।

অপর্ণা দেবী বুঝতে পারেন, সুপ্রিয়ার মনের চিন্তা-ধারার গতিপথ কোন্ দিকে। তাই ও প্রসংগ চাপা দিয়ে বলেন: ওকি বৌমা! চুপ কোরে বসে যে? ভাত খেয়ে নাও।

চমক্ ভাঙে সুপ্রিয়ার। বলে: খিদে মন্দা লাগছে।

নাও মাছটুকু দিয়ে ভাত ক'টা খেয়ে ফেল দিকি।

নিজের পাত থেকে মাছ তুলে সুপ্রিয়ার পাতে দেন। সুপ্রিয়া বাধা দেয়: ও কি করছেন? আপনি কি দিয়ে খাবেন?

আমার অম্বল আছে। এই তো খাবার বয়েস; না খেলে খাটবে কি করে?

সুপ্রিয়া আর কিছু বলে না। মাঝে মাঝে সব কিছু এতো তেতো লাগে যে, তা বোধহয় মুখে বলা যায় না। সারা পৃথিবীটা একেবারে বিস্বাদ ঠেকে। কিছু ভালো লাগে না, আকণ্ঠ গরলে ভরে যায়।

আঁচিয়ে নিজের ঘরে যাবার সময় অপর্ণা দেবী বলেন: দুধটা মনে করে ঘরে নিয়ে যেও, বিজয়কে দিও।

বুড়ো ছেলের আর দুধ কেন! আপনি খান…

ওর দুধ ছাড়লেই অসুখ করে…ভুলো না কিন্তু…

দুধের বাটিটা ঘরে এনে সুপ্রিয়া বলে: নাও গেলো…

হেসে বিজয় বলে: এতো মধুর সম্বোধন যে হঠাৎ!

আচ্ছা তোমার লজ্জা বলে কিছু নেই?

হঠাৎ জলে ওঠে সুপ্রিয়া—এতোক্ষণ পরে একেবারে ফেটে পড়ে। মুখটা কঠিন হয়ে ওঠে, বলে: আর কতকাল বসে বসে অন্ন ধ্বংসাবে?

সত্যি অবাক লাগে বিজয়ের। কাজ সে করতে পারে না, তার জন্যে ব্যথা তারও কম নয়। দুঃখ পেয়ে হা-হুতাশ করে তা প্রকাশ করাকে সে বাড়াবাড়ি বলে মনে করে। তার বেকারত্বকে যে অন্ন-বিস্তর সকলেই কটাক্ষ করে তা সে বোঝে। আজ সুপ্রিয়ার কথাটা তার বুকের মাঝে বেঁধে। জামাটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

সুপ্রিয়া বলে: এই দারুণ রোদে কোথা যাও?

চুপ বিজয়।

দুধটা খেয়ে নাও।

না।

বেরিয়ে যায় বিজয়। স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকে সুপ্রিয়া।

সঞ্জয়-ই কথাটা সব প্রথম বলে: দেখলে বৌদি, টাকার মহিমা!

সুপ্রিয়া বুঝতে পারে, সঞ্জয় কি বলতে চায়। ব্যাপারটাতে তারও মনে কম বড়ো আঘাত লাগেনি তবু তা নিয়ে সে কোন কথা বলতে নারাজ। সঞ্জয়ের কথা না-বোঝার ভান করে বলে: কি ব্যাপার?

তোমরা কি বৌদি, চোখ-কান বুজে বাস করতে চাও? দাদা নিজের মুখে মুড়োটা চাইলো অথচ সেটা গেল মেজ-কর্তার পাতে! টাকা সে বেশী রোজগার করতে পারে তা বলে কি দাদা মা-র ছেলে নয়?

এ প্রশ্নের জবাব দিতে চায় না সুপ্রিয়া। আজ রবিবার। কাল অজয়ের মাইনে হয়েছে। বাড়ীতে এসেছিল আজ গোটা মাছ। বিজয় চিরকাল মাছের মুড়ো খেতে ভালবাসে। মাছ আসতে সে বলেছিল: মা, মুড়োটা আমার তো?

অপর্ণা দেবী বলেছিলেন: আর কেই-বা খাবে! ওরা তো কেউ মুড়ো ভালবাসে না। আগের দিন অজয় খেয়েছে, আজ তোর্।

কিন্তু খেতে বসে দেখা গেল, মুড়ো পড়েছে অজয়ের পাতে। সঞ্জয় বলে উঠল: এ কি হল?

অজয় যে চাইল।

দাদাও তো চেয়েছিল।

বিজয়-ই বলেছিল: থাক্ না ও, কি হয়েছে তাতে?

সঞ্জয় আর কিছু বলেনি। কিন্তু তার মনের মধ্যে আষাঢ়ের মেঘ ছায়া ফেলে। মা-র অজয়ের প্রতি পক্ষপাতিত্ব শুধু আজ নয়, আরো বহুবার প্রকাশ পেয়েছে। এই তো সেবার পুজোর সময়

কারোর জামা-কাপড় হলো না অথচ অজয়ের সব হলো। সঞ্জয় বলেছিল : মা, তুমি কি একচোখ বন্ধ করে রেখেছ ?

কেন রে ?

তোমার ছেলে শুধু মেজ-কর্তা একলা ?

কিন্তু হলো কি ?

মানে তেলা মাথায় তেল পড়েছে। দাদার কাপড় ছিঁড়ে গেছে, তার কাপড় কেনা দরকার অথচ কাপড় এলো মেজ-কর্তার। মা, টাকা বড়ো মিষ্টি না ?

অপর্ণা দেবী চুপ কোরে থাকেন। এ অভিযোগ যে কতোদড়ো মিথ্যে তা বোঝাবার শক্তি তাঁর ছিলো না। অজয় উপায় করে বেশী, সংসারটা তারই আয়ের ওপর কোনোরকমে টিকে রয়েছে। বাড়ীর গিন্নী হয়ে সব সময় সকলের প্রতি সমান বিচার করা যায় না।

শুধু বলেছিলেন : ও বল্লে, না করতে পারলুম না।

করবে কি করে, টাকা যে তোমার মনকে বেঁধে ফেলেছে।

অপর্ণা দেবী অবশ্য এর কোন জবাব দেননি। শুধু ক্লান্ত, অসহায়, বার্ধক্য-ক্ষীণ চোখ দুটো তুলে তাকিয়েছিলেন ক্রুদ্ধ সঞ্জয়ের দিকে।

মাঝে মাঝে এ রকম তুচ্ছ অবিচার এবং নিদারুণ অবহেলা চলতে থাকে। বাড়ীর এতগুলো লোক যেন অপর্ণা দেবীর চোখে পড়ে না, তাঁর দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন কোরে রাখে অজয়। দৃষ্টি-অন্ধ অপর্ণা দেবীর কাছে সকলে ঝাপ্‌সা হয়ে যায়, বুঝিবা যায় মিলিয়ে।

তুচ্ছ বলে ধরে নেয় সুপ্রিয়া, হেসে উড়িয়ে দেয় বিজয় কিন্তু অত সহজে অমনি অবহেলা হজম করতে পারে না সঞ্জয়। তাই সে অভিযোগ কোরে বেড়ায়, হয়ত তার অভিযোগ কার্যকরী হয় না তবু সে করে, না কোরে পারে না।

আজ সুপ্রিয়া বলে : তোমার রাগ মিথ্যে, ঠাকুরপো।

দেখ, বৌদি, নিজেদের আর অমনি কোরে ছোট কোরো না। দাদার প্রতি অবহেলা দেখাবার কারণ আর কিছুই নয়, শুধু দাদাকে বুঝিয়ে দেওয়া যে, তোমার উপায় করবার যখন মুরোদ নেই তখন খাবারও কোন অধিকার নেই।

এবার বিজয় বলে : তুই লেখাপড়া শিখে কি হচ্ছিস্ ! সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে এমনি করবার কি এমন থাকতে পারে তা বুঝতে পারি না।

সেদিন সুপ্রিয়ার কাছে আঘাত খাবার পর বিজয় কেমন যেন মিইয়ে গেছে, হাসি-খুশি, রঙ্গ-রস-প্রিয় বিজয় নিভে গেছে, তার রূপান্তর সুপ্রিয়ার দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না।

সঞ্জয় বলে : দাদা মিথ্যে বকে নিজের আর অপমান কোরো না।

অপমান !

বিজয় চমকে ওঠে।

তা ছাড়া আর কি ?

বিজয় ঠায় তাকিয়ে থাকে সঞ্জয়ের মুখের দিকে। বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে ওঠে মুখের প্রতিটি রেখায় রেখায়। বলে : তুই ঠিক বলছিস্ ?

নিজের ভুলটা বুঝতে পারে সঞ্জয়। রাগের মাথায় ও-কথাটা বলে ফেলে সে বিজয়ের সুপ্ত বেদনাকে জাগিয়ে তুলেছে। সেও আর কিছু বলতে পারে না। বোবা-করা মন্ত্রের বাতাস বয়ে যায় ঘরের মাঝ দিয়ে। সকলে নির্বাক।

একটু পরে সঞ্জয় বলে : যাই, বৌদি।

সে চলে যায়।

সুপ্রিয়া মুখে কিছু না বললেও তার মন ভরে ওঠে ব্যথা-বেদনায়। অপর্ণা দেবীর অবহেলা তার হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়। বলবার তার কিছু নেই, তার জোর যে-বিজয় সে পঙ্গু, সে শুধু মার খেয়ে বোবা চোখে তাকিয়ে থাকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ কোরে। এ বাড়ী তার আর ভালো লাগে না ; প্রতি পদে পদে অপমানের চাবুক পড়ে সর্বাঙ্গে। বিজয়কে বলে : চলো, চলে যাই।

কোথা ?

অন্য যেখানে হোক্।

যেতাম যদি না খোকা থাকত। ভবিষ্যৎ কি তাতো আমার জানা, বাপ হয়ে ছেলের গলা টিপে ধরি কি কোরে ?

ছেলেটা ঘুমোয়। চোখ দুটো বোজা ; কুঁচ-কালো কোঁকড়া একমাথা চুল একটু একটু বাতাস লেগে কেঁপে ওঠে ; কচি মুখে শান্তির এক অপূর্ব ছায়া ভাসে। অভিশপ্ত শিশু !

বাইরের আকাশে কাঠ-ফাটা রোদ ; জলে যায় শ্যামলা পৃথিবী।

সন্ধ্যের দিকে সুপ্রিয়ার বাবা সত্যকিঙ্করবাবু আসেন। সুপ্রিয়ার ছোট বোনের বিয়ে, সুপ্রিয়াকে আগে থাকতে পাঠিয়ে দিতে হবে।

বিনোদবাবু বলেন : নিশ্চয় যাবে।

তারপর সুপ্রিয়াকে লক্ষ্য করে বলেন : কি বৌমা, কবে যাবে ?

এর কোন জবাব দেয় না সুপ্রিয়া। যেতে তার আদৌ ইচ্ছে নেই। বাপের বাড়ী সে যেতে চায় না কারণ তাহলে শ্বশুর-বাড়ীর দৈন্য ধরা পড়ে যাবে বাবা-মা-র কাছে। গায়ের গয়না একটিও নেই, সব বন্ধক পড়েছে। সালঙ্কারা হয়ে এসেছিল, নিরাভরণা হয়ে ফিরে যেতে তার বেজায় বাধে। নিজেদের চরম দারিদ্রকে ওদের কাছে তুলে ধরতে লজ্জায় তার মাথা কাটা যায়।

বিনোদবাবু সত্যকিঙ্করবাবুকে বলে দেন : আপনি যান বেয়াই মশাই, বৌমাকে আমরা পাঠিয়ে দোব। —তারপর বলেন : আমারও পাঠাতে একটু আপত্তি আছে।

কেন ? —সশঙ্কিত প্রশ্ন সত্যকিঙ্করবাবুর।

আমার ঘরের আলো নিবিয়ে আপনার ঘর আলোকিত করব এতোবড়ো বোকা আমি নই—বুঝলেন ?

হেসে ওঠেন সত্যকিঙ্করবাবু : এতোদিন কি আপনার ঘর অন্ধকার ছিলো ?

না বেয়াই মশাই, মা লক্ষ্মী আমার ঘরের আলো।

কন্যা-গর্বে স্ফীত হন সত্যকিঙ্করবাবু, বলেন : আপনিও যাবেন কিন্তু।

আমি আবার কেন ?

তাহলেও যাবেন একবার। ···আচ্ছা, আজ আসি···

সত্যকিঙ্করবাবু চলে গেলে সুপ্রিয়া রান্নাঘরে আসে। রুটি বেলতে বেলতে বার বার মন উন্মন হয়ে যায়। বিয়ে বাড়ীর একটা দৃশ্য ছায়াছবির মত তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কতো লোক, কতো আলো! আর তার পাশে তার নিরাভরণ দেহ—চমকে ওঠে সুপ্রিয়া। নিজের কাছেই এ দৃশ্য এতো খারাপ লাগে তার!

অপর্ণা দেবী এসে বলেন : বৌমা, এখনো রুটি বেলা হলো না ?

হয়ে এলো।

তুমি ওগুলো সেঁকে ফেল, আমি বেলছি···

সুপ্রিয়া রান্নাঘরে উঠে যায়।

অপর্ণা দেবী রুটি বেলতে বেলতে বলেন : তোমাকে পাঠিয়ে দিলে কি করে যে কাজ চলবে।

সুপ্রিয়া চুপ থাকে।

ভাবি তোমায় পাঠাব কিন্তু পাঠালে চলবে কি করে ভেবে কূল-কিনারা পাই না। দেখনা, নিজের মেয়েরা পটের বিবি। ওদের হাঁড়ির হাল হবে এ তোমাকে আমি বলে দিলুম।

সুপ্রিয়া এবার বলে : আমি যাব না, মা।

যাবে না কেন ? বোনের বিয়ে, আমোদ-আহ্লাদ করবে, যাবে না কেন ?

সুপ্রিয়া কিছু বলে না।

অপর্ণা দেবী বলেন : আমাদের কষ্টের কথা ভাবছ ? তা বৌমা, তুমি গেলে আমাকে কষ্টে পড়তে হবে, তা বলে তোমাকে আটকে রাখব কেন ? আর এই তো হেসে খেলে বেড়াবার সময়।

সুপ্রিয়া এবার একটু জোর করে বলে : আমার যাওয়া হবে না।

কেন ?

শুধু গায়ে যেতে পারব না।

শুধু গায়ে মানে ?

ন্যাড়া-বোঁচা হয়ে যাব কি করে ?

বেলুন থেমে যায় অপর্ণা দেবীর। সুপ্রিয়ার কাছ থেকে এ রকম কোন উত্তর প্রত্যাশা করেন নি তিনি। তিনি জানতেন, সুপ্রিয়া যেতে চায় না তাঁর কষ্ট হবে বলে কিন্তু এখন কোথা সুপ্রিয়ার আপত্তি তা ধরা পড়ে তাঁর কাছে। সুপ্রিয়াকে নোতুন আলোয় দেখেন তিনি। বলেন : তোমার শ্বশুর যখন জিজ্ঞেস করলেন তখন এ কথা বললে না কেন ?

সুপ্রিয়া চুপ।

যাবে না ?

না।

রাগ চড়ে যায় অপর্ণা দেবীর : কুটুমের কাছে তোমার শ্বশুরের মাথা নোয়াবার কি দরকার ছিলো ?

তারপর চড়া গলায় বলেন : যদি মনে মনে জিলিপির প্যাঁচ রয়েছে তবে আগেই তা বলতে পারতে ?

অপর্ণা দেবীর গলার শব্দে বিনোদবাবু বেরিয়ে আসেন : কি হলো, চ্যাঁচাচ্ছ কেন ?

অপর্ণা দেবী ক্রোধোন্মত্ত কণ্ঠে বলেন : বৌ তোমার লক্ষ্মী-প্রতিমা! আমি ভাবি, বাপের বাড়ী যেতে চায় না আমাদের কষ্ট হবে ভেবে, ওমা, তা নয়। পেটে এত ছিল!

কি হলো তাই বলো না।

উনি রাজরাণীর পোষাক-আষাক না পেলে বাপের বাড়ী যাবেন না।

বৌমা তাই বললে ?

মিথ্যে বানিয়ে বলছি ? প্রায়ই দেখি, মুখ গোমড়া কোরে বেড়ায়—গয়নার শোক!

তারপর সুপ্রিয়াকে লক্ষ্য করে বলেন : তোমার একলার বাঁধা পড়েছে, আমার পড়েনি ? সংসার আগে না ভাবনা আগে ?

বিনোদবাবু বলেন : রাতে এসব কি কেলেঙ্কারী করছ ? চুপ করো।

কেলেঙ্কারীর বাকি এখনো অনেক দেরী। উনি যাবেন না, তোমার কথার দাম রইল কৈ ?

সত্যি বৌমা যাবে না ?

তোমার আদরের ঘরের আলোকে জিজ্ঞেস করো।

থাক, চুপ করো, পাড়ার পাঁচজন ভাববে কি ?

এবার থেকে ওকে জিজ্ঞেস কোরে তবে কথা দিও। গয়নার শোকে উনি পাগল। কি রকম ভোলাত আমাদের! কালসাপ!

সুপ্রিয়া শুধু চুপ কোরে বসে থাকে। সকালের ব্যাপারটা তার মনে দগ্ দগ্ করতে থাকে। বিজয়কে অপমান করেছেন অপর্ণা দেবী—মর্মে মর্মে তার দুঃসহ যন্ত্রণার শলাকা বিঁধে থাকে। ভাবে, বলে সব। একবার ফেরে বলবার জন্যে কিন্তু বিনোদবাবুর সামনে মুখ খুলতে পারে না। স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। বিনোদবাবু বলেন : বেশ তাই হবে।

তোমার ভালোমানুষী কাল হবে।

হোক। চলো···

বাড়ীটা মরে যায়। বুকের ওপর কান পেতে দিলেও একটুও শব্দ পাওয়া যায় না। এমনি শান্ত, এমনি নীরব-নিঝুমতার মধ্যে এ প্রাণহীন বাড়ীটা যেন অনাদিকাল ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সকলের খাওয়া-দাওয়া মিটে যায়। সুপ্রিয়া অপর্ণা দেবীর খাবার দিয়ে ডাকে : মা, খাবেন আসুন।

তোমার খাবার কোথা ?

আমার খিদে নেই।

কেন ?

খিদে পাচ্ছে না।

আবার জলে ওঠেন অপর্ণা দেবী : খিদে পাচ্ছেনা, না আমার সঙ্গে খাবে না ? সারাদিনের পর একটু গল্প করি, না হয় করবো না।

বিজয় বেরিয়ে আসে ঘর থেকে, বলে : মা, কি হচ্ছে ?

মায়ের দোষটা আগে চোখে পড়লো ?

অকস্মাৎ বিজয় বলে : বলো মা, আমরা দুজন চলে যাই।

না পোষায় যাও।

বেশ যাব। বিজয় ঘরে ফিরে আসে।

রাতে সুপ্রিয়া কান্নায় ভেঙে পড়ে, বলে : যদি না যাও তবে আত্মহত্যা করবো।

যাব, প্রিয়া, যাব।

সকালে ওঠে সুপ্রিয়া। কাল রাতের ক্লান্তি তার দেহের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে জড়িয়ে থাকে। অনেক দিনের অনেক অপমানের বোঝা নাবাবার সময় এসেছে তার। হয়ত, হয়ত কেন, নিশ্চয়, খুব বেশী সুখ থাকবে না, তবু থাকবে স্বস্তি। সেই ভালো।

চা কোরে বিনোদবাবুকে দিয়ে আসে। অন্যান্য দিন বিনোদবাবু নানান কথা কন, নিদেন পক্ষে খবরের কাগজ আসার সংবাদ একবার নেন, আজ শুধু একবার সুপ্রিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন : কাগজটা এলে পাঠিয়ে দিও।

বাড়ীটা বেশ থম্‌থমে। প্রতি পদক্ষেপে মনে হয়, এই বুঝি স্তব্ধতা ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যাবে। এ বাড়ীর প্রতিটি ইট-কাঠ তার দিকে চেয়ে থাকে। সে যেন নবাগত এদের মিছিলে।

রান্না করে সকলকে দেয়। আজ অপর্ণা দেবী বলেন : আজ খাবোনা ষষ্ঠীর উপোষ।

সে প্রশ্ন করে : কি ষষ্ঠী ?

চাপড়া।

এই তো সেদিন হলো ?

তবে নীল

আজ তো কোন ষষ্ঠী নেই।

এবার বিরক্ত হয়ে অপর্ণা দেবী বলেন : আমায় খাবার জন্যে বলো না, শরীর আমার বড্ড খারাপ।

সুপ্রিয়া আর কোনো কথা না বোলে বেরিয়ে আসে। রান্নাঘরে এসে বাড়া ভাত হাঁড়িতে তুলে রেখে চলে আসে নিজের ঘরে। কাল রাতের সামান্য কথা নিয়ে অপর্ণা দেবী আজ মিথ্যা অজুহাত দিয়ে উপোষ করে রইলেন ! সারাদিন নিরম্বু উপবাস ! তার-ই জন্যে যখন সব গণ্ডগোল, বেশ সেও খাবে না। এ বাড়ীতে সে আর জলটুকু পর্যন্ত ছোঁবে না।

বিজয় আসে। বলে : ঘর ঠিক কোরে এলাম।

কোথা ?

মহেশ পণ্ডিত লেনে। একখানা ঘর, যদিও মাটীর, ভাড়া বারো টাকা।

কবে যাবে ?

কাল।

সুপ্রিয়া একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলে। যাক্ সে চলে যাবে ; তাতে তার এতোটুকু ক্ষোভ নেই। বাড়ীর সকলে তো শান্তিতে থাকবে। এই তার সুখ।

বিকেলে সঞ্জয় অপর্ণা দেবীকে বলে : যাক্ দাদা বাঁচলো। মেজ-কর্তাকে নিয়ে তুমি সুখে থাক। টাকা যে মায়ের স্নেহ ভাগকোরে দিতে পারে তা তোমার ব্যবহার প্রমাণ করে দিল।

বিজয় চলে যাচ্ছে ?

যাবে না তো কাঁহাতক পড়ে পড়ে অপমান সহ্য করবে ?

কবে ?

কাল।

ওঃ।

বাইরের অস্তমান সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকেন অপর্ণা দেবী। গম্ভীর আকাশের মত মনটা ভারী হয়ে ওঠে। অমনি শূন্য, অমনি উদাস তাঁর মন।

রাতে সুপ্রিয়ার চোখে ঘুম আসে না। অনুভব সে করতে পারে না কি তার অন্তরের চাঞ্চল্য তবু কেমন যেন এক অস্বস্তি তার অন্তরের নিভৃতে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কাল চলে যাবে সে। যাবার আগে মুক্তির আস্বাদ সে পেয়েছিল কিন্তু সময় যত এগিয়ে আসে সে-আনন্দ, সে-উৎসাহ যেন সব নিভে আসে।

বিজয় অঘোরে ঘুমোয়, তার পাশে ছেলেটা। সে বাইরে আসে। আকাশের চাঁদের আলো গড়িয়ে পড়ে সারা বাড়ীটার গায়ে। স্তব্ধতা জমে থাকে প্রতি কোণে কোণে।

শেষ রাত। ভাবে সুপ্রিয়া : শেষ রাত। কাল চলে যাবে। কতো কথা তার মনে পড়ে : প্রথম আসার দিন থেকে আজ পর্যন্ত সব ঘটনা ছায়াছবির মত তার মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে তার।

হঠাৎ তার কানে আসে অপর্ণা দেবীর গলা : ওরা কাল চলে যাবে। সঞ্জয় বলে, আমি অজয় ছাড়া কাউকে ভালোবাসি না ; এতোবড়ো অপবাদ ওরা দিতে পারলো ?

ওটা তো মিথ্যে। —বিনোদবাবুর স্বর।

ওরা তো সত্যি বলে জানে। সংসার চালাতে গেলে কত-কি করতে হয় তা ওরা জানবে কি করে ? সঞ্জয় বলে, ওরা আমার ছেলে নয় !

তা বলে কাঁদবে ? সারাটা দিন উপোষ করলে কেন বলোত ?

জানো, বৌমা কাল থেকে খায়নি ? সকলে রাগ করতে পারে, আমি পারিনা ? সকলে মিথ্যে বলবে, খালি আমি চুপ কোরে থাকব ?

তুমি যে বড়ো গাছ, ঝড় তো লাগবেই তোমাকে।

একটু চুপ।

আবার অপর্ণা দেবীর গলা : বিজয়টা চলে যাবে, উপায় নেই, খাবে কি ? একরত্তি একটা ছেলে সঙ্গে ওকেই বা মানুষ করবে কি কোরে ?

ঘুমোও তুমি।

এতে ঘুম আসে ? বৌমা সংসারের কি বোঝে যে বাইরে যেয়ে ঘর করবে ? নেহাৎ কচি বৈত না !

ভবিতব্যকে ঠেকাবে কি কোরে ?

ভগবান, মা করেছিলে কেন ?

আবার কাঁদে…

ফোঁপানির শব্দ শুনতে পায় সুপ্রিয়া। গভীর রাত। নিস্তব্ধতার বুকে চাপাকান্নার ধ্বনি গুম্‌রে গুম্‌রে ওঠে। আকাশের বুকে জ্বলা তারাগুলো কাঁপে থরো থরো। তার অন্তর অমনি কাঁপে।

কতোক্ষণ সে বসে থাকে। নিশ্চল, নিস্তব্ধ।

উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় বাড়ীটা ফর্সা দেখায়। একটা কাকের ডাকে তার চমক্ ভাঙে। চম্‌কে ওঠে সে : সকাল হয়ে গেল না কি ? —না, কাক-জ্যোস্নাকে সকাল ভেবে একটা কাক বাসা ছেড়ে

অজানার পথে ভেসে পড়েছে। ব্যাকুল ওর স্বর।

পরের দিন সকালে বিজয় বলে : কখন যাবে ?

রাতে খেয়ে। জবাব দেয় সুপ্রিয়া।

সারাদিন কাটে। অপর্ণা দেবী আজও খান না অসুখের দোহাই দিয়ে। সুপ্রিয়া বেশী পীড়াপীড়ি করতে পারে না। বাড়ীর সকলেই ভয়ে ভয়ে কাটায়।

সন্ধ্যের সময় বিজয় বলে : যাবে কখন ?

খাওয়া-দাওয়া করে।

তাড়াতাড়ি কিন্তু।

আচ্ছা গো।

সকলের খাওয়া হয়ে যায়। সুপ্রিয়া অপর্ণা দেবীর ঘরে যায়, বলে : মা, খাবেন চলুন।

আমার খিদে নেই।

একটু চুপ কোরে থাকে সুপ্রিয়া। অপর্ণা দেবী জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে তারা-ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন। সুপ্রিয়া আর থাকতে পারে না। বলে : মা, আর কতোদিন উপোস কোরবো ?

কেন ? —চম্‌কে ওঠেন অপর্ণা দেবী।

আপনি না খেলে আমি খাই কি কোরে ? ...চলুন...

কখন যাবে ?

সে পরে হবে'খন। আপনি চলুন...

আমি খাবো না।

খেতেই হবে।—এবার সুপ্রিয়া অপর্ণা দেবীকে জোর করে তুলে নিয়ে আসে রান্নাঘরে। পাশাপাশি থালায় খাবার। বসেন দু'জনে।

সুপ্রিয়া বলে : মা, আপনার শরীর বড্ড খারাপ হয়ে গেছে, আপনি দিন কতক বাইরে যান।

সংসার কে দেখবে ?

আমি তো রৈলুম।

তুমি !

মুখ তুলতে পারে না সুপ্রিয়া, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে রুটির ওপর। অপর্ণা দেবী বলেন : খাবারে চোখের জল ফেলতে নেই, গেরস্তের অমঙ্গল হয়।

সুপ্রিয়া মুখ তোলে—অপর্ণা দেবীর চোখও চক্ চক্ করে।

পান চিবোতে চিবোতে ঘরে ঢোকে সুপ্রিয়া। বিজয় বলে : খেয়াল আছে, কটা বেজেছে ?

হাসে সুপ্রিয়া। বলে : হ্যাঁ, জী।

যাবে কখন ?

এই এবার।

সে মশারির মধ্যে ঢুকে খোকাকে জড়িয়ে ধরে বলে : যাব, তবে অন্য কোথাও নয়, মানিকতলায় এবং আর কেউ নয়, শুধু আমি আর খোকন।

মানে ?

তোমার খৈয়ামে এর মানে নেই ? যাক্, আলোটা নিবিয়ে দাও, বেজায় ঘুম পাচ্ছে...

থ' হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বিজয়। ভাবে, মেয়েগুলো যেন কি !

উপন্যাস

পুরশ্চরণ

(পূর্বানুবৃত্তি)

মদন বন্দ্যোপাধ্যায়

চন্দ্রাবলী একটু বিমূঢ়। কিছু বোঝে, কিছু বোঝে না। ছোড়দাকে কোনদিন বেশী ভাবেনি। অনেক দূরত্ব ছিল দুজনের মাঝে। আর ভাবার মত মনটাও তার ছিল আলগা। কিন্তু আজ একটা জিজ্ঞাসা উঁকি দেয় মনের মধ্যে।—কি হয়েছে ? এত ভাবনাই বা কেন ছোড়দার ? তাই জিজ্ঞেস করলে ও শান্তিকে—ছোড়দার কি হয়েছে শান্তিদি ?

—কি আর হবে, যা হয় ভাবুক বাবুর। অসুখ হল একজনের আর সঙ্গে সঙ্গে ওনারও মনে অসুখ হয়ে গেল। যেই শুনল ঠাক্‌মার অসুখ, অমনি জ্বরথুবু হয়ে গেল।

চন্দ্রাবলী একমনে শুনছিল শান্তির কথাগুলো। ছোড়দার মনের আবিষ্ট ভাবটা কেন, তা এখন বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারে চন্দ্রাবলী। বাড়ীতে রাগারাগি হয়, বুঝতে কষ্ট হয়না মন-খারাপের কারণ—পষ্টাপষ্টি চোখে ভাসে। মা কি ঠাক্‌মার মন-খারাপের এমনি জানাশোনা কারণ চন্দ্রাবলী অনায়াসে। কিন্তু এমন অনেক কিছু আছে যা সরাসরি ঠিক বোঝা যায় না। অনুমান করা ছাড়া উপায় নেই। অনুমান নির্ভুল কিনা সেটা প্রমাণ হয় বেশীটুকু জানার ওপরই। এ বাড়ীতে তার ভাই-বোন, মা-বাপ, কাকা, ঠাক্‌মাকে এক এক করে তলিয়ে কোন দিন ভাবেনি। হয়ত কোন একটা ঘটনাকে অবলম্বন করে কিছুক্ষণের মধ্যে একটা ধারণা তারপর একটা সিদ্ধান্ত করে চন্দ্রাবলী সরে গেছে অন্য জায়গায়। এক জায়গায় চুপ করে কারো জন্যে এতদিন ভাবেনি চন্দ্রাবলী।

চন্দ্রাবলীর আজ হঠাৎই মনে হল, তার চোখেও তার ছোড়দার মন অনেক নরম—হ্যাঁ নরম আর ছেলেমানুষই তো, তা নইলে সামান্য অসুখে মেয়েদের থেকেও এত ভাবনা মনের মধ্যে। একটা হাসির ঝিলিক জাগে আর তার সঙ্গে একটা জিজ্ঞাসা প্রকাশ পায়—আচ্ছা শান্তিদি, ছোড়দাটা খুব ছেলেমানুষ নয় ?

—হ্যাঁ, তা ত বটেই। তুই যখন চার ছেলের মা হয়েছিস, তখন সত্য ত ছেলে মানুষই। হেসে বললে শান্তি।

—ধ্যেৎ, আমি যেন তাই বলছি। লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে চন্দ্রাবলী।

—চার ছেলের মা হলে কি করতিস্ বলুত চন্দ্রা ?

—যাও, তোমার সব তাতেই ঠাট্টা।

—ঠাট্টা, তা বটে। ঠাক্‌মা ত এখন থেকেই তোর বর খুঁজতে লেগে গেছে। বিয়েটা হলে

তখন দেখব কত লজ্জাবতী থাক।

—বিয়ে ত আমি করবো না। তলার দিকে মুখ নিচু করে আঙুল দিয়ে রেখার জাল বোনে চন্দ্রা।

—বিয়ে করবিনে, তবে কি করবি? জজিয়তি করবি নাকি?

—না, অমনি করব না। বিয়ে করলে কত ঝামেলা। এবার চোখ দুটো তুলে বললে চন্দ্রাবলী।

—কে বলে তোর বুদ্ধি নেই? খাসা তোর মাথা চন্দ্রা।

—সত্যি শান্তিদি, বিয়ে আমি করব না। তার চেয়ে—

—তার চেয়ে ওই রূপ নিয়ে যোগিনী হয়ে বৃন্দাবনে যাবি! যা মর মুখপুড়ী, এতই যদি বৈরাগ্য চিতে, তবে এত রূপ নিয়ে এলি কেন মরতে পৃথিবীতে?

চন্দ্রাবলী শান্তির দিকে চেয়ে হেসে বললে—আমাকে কি এতই সুন্দর দেখতে?

—ঢঙ দেখ মেয়ের! নিজেকে দেখিস নে আর্শিতে, রাস্তায় বেরোস নে? পুরুষগুলো গেলে না তোকে তাদের ড্যাবড্যাবে চোখ দিয়ে? ঢঙ করার বয়েস ত পেরিয়ে গেছিস।

—সত্যি বলছি শান্তিদি, এসব কিছু খেয়াল করিনি।

—করিস নি, আয় দেখাচ্ছি। এই বলে শান্তি চন্দ্রার হাত ধরে টেনে তুলল।

—কোথায় যাব? দাঁড়াও হাত ধুই। বলে চন্দ্রা আস্তে আস্তে হাতটা শান্তির মুঠি থেকে ছাড়িয়ে নিল, তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে নীচে কলতলায় হাত ধুতে গেল।

শান্তিও রান্নাঘর থেকে ওপরে বারান্দায় উঠে একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলল। বেশ একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল শান্তি। কিন্তু কেন? হয়ত অস্বাভাবিক কিছু সহ্য হয় না ওর, তাই। যে সময়ের যা তাই ভাল, চাপা দেওয়াটা ওর স্বভাববিরুদ্ধ।

বয়সের ব্যবধান বছর পাঁচেকের কিন্তু অভিজ্ঞতা আর বুদ্ধির দিক থেকে শান্তির কাছে চন্দ্রাবলী অনেক শিশু। চন্দ্রাবলী ষোল পেরিয়ে সতেরোয় পড়েছে, কিন্তু সতেরো বছরের মেয়েলি বুদ্ধিটা যেমন পাকে, চন্দ্রাবলীর তা মোটেই পাকে নি। অনেক কাঁচা তার মন আর বুদ্ধি। কারণটা ওর নিঃসঙ্গপ্রিয়তা—কোন কিছুতেই ও নিজেকে জড়াতে চায় নি। সেই জন্যই সকলের চোখে ও বোকা, চাপাক বুদ্ধিমতী মেয়ে বলে এ বাড়ীতে এক শান্তিকেই সকলে জানে। অনেক বিজ্ঞ, তীক্ষ্ণধী পুরুষকে টেক্কা দিতে শান্তি পেছ-পা হয় না। আর মেয়ে মহলে ওর যথেষ্ট প্রভাব। শান্তির মা রায়গিন্নিও ওর কথার ওপর কথা বলেন না। বাইশ বছরের এই বিধবা মেয়েটি পাশাপাশি দুটি পরিবারের মধ্যে একটা বিশেষ স্থান করে নিয়েছে যা মেনে নিতে ছেলে-বুড়ো কেউই দ্বিধা করে না। শান্তির একটা নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আছে। সরল ও সাবলীল। আন্তরিক সুষমায় পরিপূর্ণ।

ক্রমশঃ

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও ৪১, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রিটস্থ সার্ভিস্ প্রিন্টার্স হইতে মুদ্রিত।

BORN 1820—STILL GOING STRONG

Make sure it's

Johnnie Walker

in your glass

FINE OLD SCOTCH WHISKY

Distributors: SHAW WALLACE & COMPANY LIMITED

ON GOVT. RATE CONTRACT

KIRON

THE BETTER LAMP

AGENTS: The ORIENTAL MERCANTILE CO. LTD

CALCUTTA • BOMBAY • KANPUR

Tropical

THE BETTER FAN

on Govt. Rate CONTRACT

AGENTS: The ORIENTAL MERCANTILE CO. LTD

CALCUTTA • BOMBAY • KANPUR

THE ORIENTAL MERCANTILE CO., LTD.

CALCUTTA, BOMBAY, KANPUR, DELHI.